ঐতিহাসিক

সম্পাদক

শ্রীনির্ম্মলরঞ্জন বসু
শ্রীনিমাই সাধন বসু

প্রথম বর্ষ

দ্বিতীয় সংখ্যা

ঐতিহাসিক

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

সম্পাদক

শ্রীঅশীন দাশগুপ্ত

শ্রীঅরুণ কুমার দাশগুপ্ত

শ্রীনিশীথরঞ্জন রায়

শ্রীনিমাই সাধন বসু

CENTRAL LIBRARY

প্রকাশক : অরুণ কুমার দাশগুপ্ত । মুদ্রক : শ্রীনলিন রায় ।
অটো-প্রিণ্ট অ্যাণ্ড পাবলিসিটি হাউস
৪৯ বলদেওপাড়া রোড কলিকাতা ৬
প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রীখালেদ চৌধুরী

বৈশাখ ১৩৮৬ । এপ্রিল ১৯৭৯

যোগাযোগের ঠিকানা
অধ্যাপক অমলেন্দু দে
ইতিহাস বিভাগ । যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা ৩২

প্রতি সংখ্যা : ৪.০০ । বার্ষিক মূল্য : ১৫.০০

প্রাপ্তিস্থান : পাতিরাম বুক ষ্টল, কলেজ ষ্ট্রীট

CENTRAL LIBRARY

ঐতিহাসিক

বৈশাখ ১৩৮৬ | সূচীপত্র | এপ্রিল ১৯৭৯

তাপস কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
এশিয়াটিক সোসাইটি (১৭৮৪-১৮৩৪খৃঃ) ॥ ১

কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
উনিশ শতকে দামোদর উপত্যকায় নিম্নবিত্ত মানুষের আর্থিক অবস্থা ॥ ২৭

অমলেন্দু দে
উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মুসলিম সমাজে নবজাগরণের ধারা ॥ ৪৪

ভাস্কর চন্দ্র
বিনয় কৃষ্ণ দেব ও সেকালের ক'লকাতা ॥ ৫৭

জহর সেন
কুণাল চক্রবর্তী
পুস্তক পরিচয় ॥ ৬৬

অনিমেষ চক্রবর্তী
আলোচনা (সুরেন্দ্রনাথের পদচ্যুতি) ॥ ৭৩

CENTRAL LIBRARY

এশিয়াটিক সোসাইটি (১৭৮৪-১৮৩৪ খৃঃ)

তাপস কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে প্রাচ্য বিদ্যা অনুশীলনের কেন্দ্র হিসেবে বাংলাদেশে বিশেষ ' করে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির গোড়াপত্তন নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠালগ্নে বাংলাদেশের সমকালীন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ এ প্রসঙ্গে বাঞ্ছনীয়। রাজনৈতিকভাবে, বাংলায় ইংরেজ কোম্পানী প্রবর্তিত কুখ্যাত দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা রদ হতে চলেছে, কোম্পানী কর্তৃক সরাসরিভাবে দেওয়ানী দায়িত্ব গ্রহণের ঘোষণা (৬ই আগস্ট, ১৭৭২ খৃঃ) ইংরেজদের জবরদস্ত রাজস্ব আদায় নীতিতে পরিসমাপ্তি ঘটাচ্ছে। ভারতীয় জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধন করার জন্য প্রশাসনিক সংস্কারের প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে, ভারতে কোম্পানীর শাসনকে অটুট রাখার উপায় হিসেবে ভারতীয় ভাষা শিক্ষা ও ভারতীয় জনসাধারণের সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পর্যায়ে চিন্তাধারা ও বার্তা বিনিময় করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে। বাংলাদেশের নবনিযুক্ত বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস স্বয়ং এ ব্যাপারে তৎপর, ভারতে আগত ইংরেজ কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে এশিয় সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ জাগ্রত করতে তিনি সচেষ্ট হচ্ছেন। সাংস্কৃতিক দিক থেকে, প্রাচ্যের গৌরবমণ্ডিত ঐতিহ্যবাহী অতীত নিয়ে চর্চা। চার্লস উইলকিন্স্, এইচ. টি. কোলব্রুক, জোনাথান ডানকান প্রমুখ একশ্রেণীর প্রাচ্যবিদদের মধ্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এঁদের মধ্যে অনেকের চিন্তাধারা অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানদীপ্ত দর্শনের প্রভাবপুষ্ট। বিশ্বজনীনতা, সহিষ্ণুতা ও যুক্তিবাদের ওপর অষ্টাদশ শতকীয় বুদ্ধিবিভাসিত চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠিত। এই সহিষ্ণুতা থেকেই অ-ইউরোপীয় জাতি ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে উক্ত প্রাচ্যবিদদের শ্রদ্ধা উদ্ভূত।১ এঁরা ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী এবং যৌথভাবে নয়, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিরাট প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে প্রাচ্যবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণায় মগ্ন।২

CENTRAL LIBRARY

উল্লিখিত পরিস্থিতিতে—অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে যখন বাংলাদেশে প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলনের সূত্রপাত ঘটছে—কলকাতার সুপ্রীম কোর্টের অবর বিচারপতি (Puisnejudge) হিসেবে বিশিষ্ট ইংরেজ প্রাচ্যবিদ ও ভাষাবিদ উইলিয়াম জোন্স কলকাতায় আসেন (অক্টোবর, ১৭৮৩ খৃঃ)। তিনি বুঝেছিলেন যে যৌথ প্রয়াস ছাড়া প্রাচ্যবিদ্যা চর্চায় তাঁর প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে পারবে না। তাঁর কথায়—**"In the fluctuating, imperfect and limited erudition of life, such enquiries and improvements could only be made by the united efforts of many...."**৩ সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলিত প্রাচ্যসাহিত্য ও বিজ্ঞান অনুশীলনের জন্য তিনি কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকদের কাছে সহযোগিতার আবেদন রাখেন। তাঁর উদ্যোগ সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার ৩০জন ইউরোপীয় নাগরিকের উপস্থিতিতে ও সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার রবার্ট চেম্বারসের সভাপতিত্বে কলকাতার সুপ্রীম কোর্টের গ্রাণ্ড জুরী কক্ষে আহূত এক বৈঠকে (১৫ই জানুয়ারী, ১৭৮৪ খৃঃ) উইলিয়াম জোন্স এশিয়ার প্রাকৃতিক ও অসামরিক ইতিহাস, প্রাচীন যুগের তথ্যাদি, কলা, বিজ্ঞান ও সাহিত্য-বিষয়ক অনুসন্ধান চালানোর জন্য একটি সভা স্থাপনের প্রস্তাব রাখেন ; এই সভা "এশিয়াটিক সোসাইটি" নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন।৪ এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসমূহকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এইভাবে : **"The bounds of its investigations will be the geographical limits of Asia, and within these limits its enquiries will be extended to whatever is performed by man or produced by nature."**৫ ঐতিহাসিক ডেভিড কফ্ এশিয়াটিক সোসাইটিকে "যৌথ মনের অভিব্যক্তি" (**expression of collective mind**) বলে বর্ণনা করেছেন।৬ ভারতে সাহিত্য ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত সমস্ত কার্যকলাপের এবং বিশ্বের অপরাপর এশিয়াটিক সোসাইটির উৎস হল কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত এই এশিয়াটিক সোসাইটি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠাবধি প্রায় ৪৫ বছর কোন ভারতীয় সোসাইটির সদস্য পদে যোগ দেন নি।৭ অথচ সোসাইটির ক্রোড়পত্রের প্রথম সংখ্যাতেই চারজন ভারতীয় পণ্ডিতের নিবন্ধ সন্নিবিষ্ট।৮ ১৮২৯ খৃঃ ৭ই জানুয়ারীর বৈঠকে পাঁচটি এদেশীয় নাম (১। প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ; ২। দ্বারকানাথ ঠাকুর ; ৩। শিবচন্দ্র দাস ; ৪। রসময় দত্ত ; ও ৫। রামকমল সেন) সম্পাদক ডক্টর এইচ. এইচ. উইলসন কর্তৃক

প্রস্তাবিত ও ডক্টর র‍্যাল্ট কর্তৃক সমর্থিত হয়।৯ "আসিয়াটিক সোসৈটির শেষ বৈঠকেতে শ্রীযুতবাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ও শ্রীযুতবাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ও শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাস ও শ্রীযুত বাবু হরময় দত্ত ঐ সোসৈটির অন্ত:পাতী হইয়াছিলেন।"১০ পরে অবশ্য আরো কিছু ভারতীয় সোসাইটির সভ্যপদে মনোনীত হন।১১

এশিয়াটিক সোসাইটি সম্বন্ধে আলোচনা করলে দুটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে—(১) ১৭৮৪-১৮৩৪ খৃ:—এই যুগটিকে সোসাইটির ইতিহাসে উন্মেষপর্ব বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এই যুগে সোসাইটিকে দুস্তর বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে পরিণতির পথে এগিয়ে যেতে হয়েছে। (২) ১৮৩৪ উত্তর যুগকে ক্রমবিকাশের যুগ বললে অত্যুক্তি করা হবে না। আলোচনার ব্যাপকতার কথা মনে রেখে এই প্রবন্ধের বক্তব্য প্রথমোক্ত যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

বর্তমান প্রবন্ধের লেখকের উদ্দেশ্য--ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে ১৭৮৪-১৮৩৪ খৃ: মধ্যে সোসাইটি যে যে অসুবিধের সম্মুখীন হয়েছিল তা তুলে ধরা এবং সেই অসুবিধে দূরীকরণে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল তার উল্লেখ করা। এর পাশাপাশি সোসাইটি লক্ষ্য পূরণে কি কর্মসূচী নিয়েছিল, সোসাইটির উন্নয়নে কাদের মুখ্য ভূমিকা ছিল এবং কতটুকু ছিল তা-ও এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হবে।

সোসাইটির সমস্যাগুলিকে প্রধানত: দুটি ভাগে বিন্যস্ত করা যেতে পারে—(১) আভ্যন্তরীণ বা গঠনতান্ত্রিক। ও (২) বহির্বিষয়ক। সোসাইটির সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানীর সম্পর্ককে বহির্বিষয়ক অঙ্গ বলা যেতে পারে। যেহেতু ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে সোসাইটির সম্পর্ক পৃথক আলোচনার দাবী রাখে সেহেতু বর্তমান প্রবন্ধ একান্তভাবেই গঠনতান্ত্রিক সমস্যাকেন্দ্রিক হবে।

গঠনতান্ত্রিক সমস্যাগুলিকে আবার ছয়টি পৃথক অথচ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যেতে পারে: (১) নিয়মাবলী ও সদস্যসংক্রান্ত; (২) বৈঠক; (৩) গৃহনির্মাণ; (৪) পাঠাগার; (৫) মুদ্রণশালা ও (৬) অর্থাদি সংশ্লিষ্ট।

(১) উনিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত কিংবা আরো পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে ঐ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত এশিয়াটিক সোসাইটির পাকা গাঁথুনি বা সুঠাম

CENTRAL LIBRARY

সংগঠন বলতে বিশেষ কিছুই ছিল না। এমন কি গোড়া থেকেই প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম জোন্সও সোসাইটির জন্য বিধিব্যবস্থা বেঁধে দেবার সম্পূর্ণ বিপক্ষে ছিলেন। কিন্তু ১৭৯৪ থেকে ১৮৩৪ খৃঃ মধ্যে বিশেষ করে জোন্স উত্তর যুগের লক্ষ্যণীয় দিকটি হল : সোসাইটির জন্য নিয়মাবলী রচনার কিংবা বুনিয়াদকে মজবুত করার ব্যাপারে একাধিক প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক্। এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম লগ্নে প্রতিষ্ঠাতা জোন্স তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বললেন— **In the infancy of any society, there ought to be no confinement, no trouble, no expense, no unnecessary formality. Let us,....for the present, have weekly evening meetings in this hall for the purpose of hearing original papers read on such subjects as fall within our enquiries....''**১২ জোন্সের ঘোষণায় এই নির্দেশ ছিল যে আলোচনার বিষয়গুলি দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে মীমাংসিত হবে এবং এই ধরণের সিদ্ধান্তের জন্য নজন সদস্যকে নিয়ে একটি সংস্থা (Board) গঠিত হবে।১৩ জোন্সের উক্ত বক্তৃতা এশিয়াটিক সোসাইটির বিধান হিসেবে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং অনেকদিন পর্যন্ত তা কার্যকর থাকে।১৪ জোন্সের জীবদ্দশায় প্রথমতঃ, সোসাইটির কর্মকর্তা এমন কি সম্মানিত সভ্য ১৫ (**honorary member**) নিয়োগের বেলায়ও কোন সুস্পষ্ট নীতি অনুসৃত হয়নি। বড়লাট ওয়ারেণ হেস্টিংসকে সভাপতির পদ অলংকৃত করার জন্য উইলিয়াম জোন্স ও অন্যান্য সদস্যেরা যে আবেদন জানান তার জবাবে ওয়ারেন হেস্টিংস নিজের সময়ের অভাবের ও জোন্সের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশের জন্য সভাপতির পদ গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন এবং যাঁর প্রতিভাই সোসাইটির প্রতিষ্ঠার মূলে তাকেই সভাপতির পদটি অর্পণ করার সুপারিশ করেন।১৬ ফলে উইলিয়াম জোন্স সহ-সভাপতি থেকে সভাপতির পদে উন্নীত হন ও তখন থেকেই সহ-সভাপতির আসন শূন্য থাকে। অবশ্য জোন্সের অনুরোধক্রমে হেস্টিংস ও তাঁর কাউন্সিল সোসাইটির প্রথম সম্মানিত সদস্য এম. কারপেনটিয়ার ডি কোসিগনির নাম একজন সাধারণ সভ্য উত্থাপন করেন ও অপরজন তা সমর্থন করেন। ১৭৯০ খৃঃ ইনি নির্বাচিত হন।১৮ দ্বিতীয়তঃ, এই নবজাত শিশু প্রতিষ্ঠানের সকলেই ছিলেন সাধারণ সভ্য; তাঁরা সুপ্রীম কোর্টের গ্র্যাণ্ড জুরী রুমে বসতেন, কিন্তু সোসাইটির সভ্য হিসেবে চাঁদা দিতেন না। নতুন সদস্যদের মনোনয়নের সময় প্রথমে তাঁদের নাম উত্থাপিত হত

CENTRAL LIBRARY

এবং একটি বৈঠকে সমর্থিত ও পরবর্তী বৈঠকে নির্বাচন হত। এই ব্যবস্থা আমাদের আলোচিত যুগের (১৭৮৪-১৮৩৪ খৃ:) মধ্যে অব্যাহত ছিল।১৯ তৃতীয়তঃ, সোসাইটির কোন স্থায়ী বাসগৃহ, দপ্তর, সম্পত্তি, কোষাধ্যক্ষ এমন কি প্রশাসনিক সংস্থাও (executive body) ছিল না।২০ সোসাইটির কাজকর্ম চালানোর জন্য সভাপতি, সম্পাদক, ও অন্য চারজন সদস্যকে নিয়ে একটি কমিটি অফ পেপারস (Committee of Papers) গঠিত হয়। সোসাইটির সভাপতি উইলিয়াম জোন্স ও সম্পাদক জি. এইচ. বার্লো প্রত্যেকটি অধিবেশনের যথাযথ বিবরণ নথিভুক্ত করতেন।২১

জোন্সের মৃত্যুর পর জোন্সের স্থান পুরণ করার মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কিত পরিচালকের অভাব দেখা দেয়। এই সময় সোসাইটির সাংগঠনিক গলদগুলি প্রকট হয়ে পড়ে,২২ জোন্সের পরবর্তী সভাপতি বড়লাট স্যার জন শোরের প্রত্যেকটি বৈঠকে অনুপস্থিতির ফলে সোসাইটি কিছু অসুবিধের সম্মুখীন হয়।২৩ কিন্তু ১৭৯৬ খৃ: ১৯শে আগস্টে অনুষ্ঠিত বৈঠক ও একই বছরের ২৯শে সেপ্টেম্বরে আয়োজিত বিশেষ কমিটির সিদ্ধান্তগুলি ছিল সোসাইটিকে উজ্জীবিত করে তোলার পথে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এশিয়াটিক সোসাইটিকে স্থায়ী করার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় খুঁজে বের করা এবং সোসাইটির ভবিষ্যৎ বৈঠকের জন্য একটি পৃথক গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করার জন্য অগাস্টের বৈঠকটি আহূত হয় ;২৪ ঐ সময় উইলিয়াম জোন্সের ঘোষণাকে আইনের আকারে বিধিবদ্ধ করা হয়।২৫ ঐ বছরের ২৯শে সেপ্টেম্বরে আহূত একটি বিশেষ কমিটি বড়লাটের মাধ্যমে একটি সনদের অন্তর্ভুক্তি, ভর্তি ফি ও অন্যান্য দৈনিক ফি, বাৎসরিকভাবে একজন কোষাধ্যক্ষ ও দুজন সহ-সভাপতি নির্বাচন, সোসাইটির পাঠাগার ও গ্রন্থশালার জন্য স্বতন্ত্র ভবন নির্মাণের সুপারিশ করে ;২৬ কমিটির প্রস্তাবানুযায়ী ১৭৯৬ খৃ: পামার অ্যাণ্ড কোম্পানী মার্চেণ্টস এর মিস্টার ট্রেল কোষাধ্যক্ষ হিসেবে ও ১৭৯৭ খৃ: জন ফ্লেমিং (১৭৯৭-১৮০২ খৃ:) ও জন হারবার্ট হ্যারিংটন সহ-সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৮১৫ খৃ: সহ-সভাপতির সংখ্যা বাড়িয়ে তিনজন করা হয়।২৭ ১৭৯৬ খৃ: নভেম্বরে দুজন সহ-সভাপতি ও চারজন অন্য সভ্যকে নিয়ে কমিটি অফ পেপারস্‌কে শক্তিশালী করা হয়।২৮ ১৭৯৮ খৃ: ২৩শে অগাস্টের বৈঠকে কলকাতার বাসিন্দা নন এমন কোন ভদ্রলোককে সোসাইটির অভ্যাগত হিসেবে

CENTRAL LIBRARY

পরিচয় করানোর সুযোগ সোসাইটির যে কোন সভ্যকে দেবার বন্দোবস্ত করা হয়। ১৭৯৯ খৃ: ১০ জানুয়ারীর বৈঠকে এতদিন পর্যন্ত অপ্রকাশিত নিয়মগুলিকে এশিয়াটিক রিসার্চসের পরবর্তী খণ্ডের অ্যাপেণ্ডিকেসর অঙ্গীভূত করার সিদ্ধান্ত হয়।২৯ সোসাইটির সংগঠনিক কাঠামো জোরদারকরণে পরবর্তী গুরুত্বপুর্ণ ধাপটি হল ১৮০৮ খৃ: সেপ্টেম্বরে সহকারী সম্পাদকের পদসৃষ্টি ; ডক্টর জে. লিইডেন পরে ঐ পদে মনোনীত হন।৩০ তৃতীয়ত:, ১৮১৫ খৃ: পর নিয়মিত-ভাবে সম্মানিত সভা নির্বাচন হত।৩১ এই নির্বাচন প্রথায় হেরফের ঘটানো হল ১৮২৯ খৃ: ; ঐ বছরের জানুয়ারী বৈঠকে ঠিক হয় যে ভবিষ্যতে সম্মানিত সভ্যদের নাম কমিটি অফ পেপারস কর্তৃক উত্থাপিত হবে ; কমিটির সভ্য নন এমন যাঁরা এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য তাঁরা কমিটির কাছে নাম পেশ করবেন।৩২ ১৮৩১ খৃ: ৬ই জুলাইএর বৈঠকে বাংলা প্রেসিডেন্সীর স্থায়ী বাসিন্দাদের বাদ দিয়ে মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বাসিন্দাদের সম্মানিত সভ্য হিসেবে সোসাইটিতে যোগদানের সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাব নেওয়া হয়।৩৩ চতুর্থত: ১৮৩১ খৃ: ৯ই মার্চের বৈঠকে গঠিত প্রবন্ধের বিষয়বস্তু প্রয়োজনবোধে এবং যে সমস্ত সভ্য গুপ্ত ভোটে নির্বাচিত হবেন তাঁদের নাম বৈঠক ডাকার সারকুলারে পরিষ্কারভাবে লেখা থাকবে বলে এক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।৩৪

(২) উইলিয়াম জোন্সের সময় দুধরণের বৈঠক বসত ; (ক) সাপ্তাহিক ; ও (খ) বাৎসরিক। সাপ্তাহিক বৈঠকগুলিকে দীর্ঘকাল যাবৎ কার্যকরী করা যায় নি ;৩৫ এর কারণ সোসাইটির অধিকাংশ ইঙ্গ ভারতীয় সভ্যের সোসাইটির কোন ব্যাপারে আগ্রহ ছিল না ; টিপু সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধের সর্বশেষ সংবাদ, কলকাতার সং দেখা প্রভৃতির প্রতি তাঁদের আকর্ষণ ছিল বেশী।৩৬ ফলে প্রতিষ্ঠাতা ও সঙ্গে সঙ্গে গুটি কয়েক লোকের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সত্ত্বেও সাপ্তাহিক বৈঠকের আগ্রহকে জিইয়ে তোলার পক্ষে গবেষণামূলক নিবন্ধাদিকে দ্রুততার সঙ্গে বৈঠকে পেশ করা যেত না।৩৭ সাপ্তাহিক বৈঠক হত বৃহস্পতিবার দিন। প্রথম কয়েক মাস পরেই বৈঠকের ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হোত এবং বর্ষার শেষে ও শরতের সূচনায় এক সপ্তাহের জন্য বৈঠক মুলতুবী রাখা হোত। (খ) বার্ষিক সভার কাজ সভাপতির ভাষণের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত থাকত।৩৮

জোন্সের মৃত্যুর পর সাপ্তাহিক সভার বদলে মাসিক সভা আয়োজন করার

CENTRAL LIBRARY

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।৩৯ ছমাসের মধ্যে দেখা গেল মাসিক বৈঠক ঘন ঘন আহূত হচ্ছে ; ১৮০০ খৃঃ ২রা জুলাইএর বৈঠকে ত্রৈমাসিক অধিবেশন আহ্বান "পর্যাপ্ত" (sufficient) বলে বিবেচিত হল।৪০ মাসের প্রথম বুধবার সোসাইটির নির্ধারিত বৈঠক বসত।৪১ শেষ সিদ্ধান্ত কর্তৃক নির্ধারিত বিরতি বেশী দীর্ঘ বলে মনে হল এবং স্বল্প পরীক্ষার পর সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের সাময়িক বিরাম কাল সহ (recess) মাসিক বৈঠকের পরিকল্পনা ফের চালু হল।৪১ প্রতি মাসের প্রথম বুধবার ছিল সভার দিন। জোন্স উত্তর যুগে বার্ষিক সভা বহুদিন যাবৎ বসে নি এবং বাৎসরিক বক্তৃতা দানেও যতি পড়ে।৪৩

উপরিউক্ত বৈঠকগুলিতে সদস্যদের হাজিরার হার ছিল নিতান্তই কম ; আমাদের আলোচিত যুগের প্রথম পর্বে তা ১২কেও অতিক্রম করে নি। নিয়ম (Precedence) কিংবা সভ্যদের কাছে বিজ্ঞপ্তি পাঠানোও প্রথানুগ ছিল না।৪৪ সহ-সভাপতি ও কমিটি অফ পেপারসের নির্বাচনের সময় কলকাতার বাসিন্দা অনুপস্থিত সভ্যদের প্রক্সির মাধ্যমে ভোট দিতে দেওয়া হবে কিনা ১৭৯৮ খৃঃ ২৭শে সেপ্টেম্বরের বৈঠকে উত্থাপিত এই প্রশ্ন সোসাইটি সরাসরি বাতিল করে দেয় (১১ই অক্টোবরের, ১৭৯৮ খৃঃ)।৪৫

উল্লিখিত ত্রুটিগুলির (অর্থাৎ অনিয়মিত মাসিক সভা, বার্ষিক বৈঠকগুলির সমাপ্তি, বৈঠকে সভ্যদের গরহাজিরা) নিরসনের জন্য একাধিক ব্যবস্থা গৃহীত হয়। প্রথমতঃ, ১৮১৮ খৃঃ কয়েকজন উৎসাহী সভ্য সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক বিষয়াদির ওপর বন্ধুত্বপূর্ণ আদান-প্রদান ও আলোচনার পক্ষে আনুষ্ঠানিক মাসিক বৈঠককে "অনুপযুক্ত" (not sufficient) বলে বিবেচনা করেন ;৪৬ ১৮২৮ সালের ২রা এপ্রিলের বৈঠকে ঠিক হয় যে

(ক) প্রতি মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বুধবার সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটে গোপন বৈঠকের জন্য বৈঠককক্ষ উন্মুক্ত থাকবে।

(খ) প্রতি সভ্য ও প্রত্যেক দর্শকের [যাকে সোসাইটির কোন সদস্য পরিচয় করাতে ইচ্ছুক] কাছে বৈঠকের দরজা খোলা থাকবে।

(গ) এই সমস্ত সভায় সোসাইটির সরকারী কাজকর্ম পরিচালিত হবে না এবং সোসাইটির অফিসারদের মধ্যে কাউকেই বৈঠকে উপস্থিত হতে হবে না।

(ঘ) এশিয়াটিক সোসাইটির পরিধির অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদির উন্নতিবিধানের মধ্যেই সোসাইটির ক্রিয়াকলাপ সীমিত থাকবে।

উক্ত ঘরোয়া বৈঠকগুলি (private meetings) কেমনভাবে আহূত ও পরিত্যক্ত হল তা প্রমাণসাপেক্ষ।৪৭ দ্বিতীয়তঃ, বাৎসরিক সভার ক্ষেত্রে ১৮২৮ খৃঃ ৫ই ডিসেম্বরের বৈঠকে স্থির হল যে সোসাইটির বার্ষিকী বাৎসরিক ভোজের মধ্যে দিয়ে উদ্‌যাপিত হবে ;৪৮ সমসাময়িক এক মাসিক পত্রিকার বিবরণ অনুযায়ী ১৮২৯ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে এক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আয়োজিত সোসাইটির বাৎসরিক অধিবেশনে ১৮২৮ খৃঃ ৫ই ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত বৈঠকের ঘোষিত উদ্দেশ্যকে রূপান্বিত করা হয়।৪৯ ১৮৩৩ খৃঃ জানুয়ারী মাসে নিয়মিতভাবে বাৎসরিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের প্রথা পুনঃপ্রবর্তিত হল।৫৯ ১৮৩৪ খৃঃ গোড়া থেকে বিস্তৃত বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করার রীতি প্রথম চালু হল।৫০ এই প্রতিবেদনে সোসাইটির মোট সদস্য সংখ্যা যে ৮৫ তার পরিষ্কার হিসেব পাওয়া যায়।৫২ এর আগে অর্থাৎ ১৮৩৪ খৃঃ পর্যন্ত সোসাইটির সদস্য সংখ্যা কি হারে বাড়ছে তা জানার কোন সুস্পষ্ট উপায় ছিল না।৫৩

বৈঠক সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল বিশেষ কমিটি (special committee) গঠন। সভ্যদের মধ্যে চিঠিপত্র বিনিময় (Exchange of notes) ও আকর্ষণীয় বিষয়াদি পঠনের জন্য সাপ্তাহিক বৈঠক আহ্বান সোসাইটি প্রতিষ্ঠার মূলে হলেও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলিকে বিচার বিবেচনার জন্য ক্ষণস্থায়ী (temporary) বিশেষ কমিটির কাছে পেশ করা হোত এবং সেগুলির নিষ্পত্তির সঙ্গে সঙ্গেই বিশেষ কমিটীর আয়ু নিঃশেষিত হত। স্বভাবতই বিশেষ কমিটীগুলির স্থায়িত্বের প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিল। সোসাইটীর গৃহ নির্মাণ পর্ব শেষ হলে পর ১৮০৮ খৃঃ জুন মাসে সোসাইটীর একজন সভ্য ডক্টর হেয়ার এই দাবী তোলেন যে বাস্তব অনুসন্ধানের (ঘটনা ও নমুনা সংগ্রহ এবং ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে যোগাযোগের) জন্য একটী কমিটী নিযুক্ত হোক্ ; তাঁর এই দাবীর প্রতি সমর্থন জানান ডক্টর লিডেন। প্রস্তাবক এই দাবীকে অবশ্য পরবর্তীকালে সংশোধন করেন—প্রাকৃতিক ইতিহাস (Natural History), দর্শন, চিকিৎসাবিদ্যা, শিল্পকলার উন্নয়ন ও "পদার্থবিদ্যা" সংস্থার অন্তর্গত যে কোন বিষয়ের জন্য একটি এবং সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ও "সাহিত্যবাচক" যে কোন বিষয়ের জন্য একটি। ১৮০৮ খৃঃ ৭ই সেপ্টেম্বরের

CENTRAL LIBRARY

সভায় এই প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়।৫৪ ঐ বছরের ৫ই অক্টোবর দুটি কমিটির জন্য নিম্নলিখিত নিয়মাবলী রচিত হয়।৫৫

(ক) প্রতি মাসের প্রথম ও তৃতীয় বুধবারে সাহিত্য সংক্রান্ত কমিটির (Literary committee) ও দ্বিতীয় এবং চতুর্থ বুধবার ফিজিক্যাল কমিটির (বা বাস্তব অনুসন্ধান কমিটি) বৈঠক এশিয়াটিক সোসাইটির গৃহে রাত্রি ৯টায় বসবে। একই সন্ধ্যায় একই সময়ে এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হলে কমিটির বৈঠক মুলতুবী রাখা হবে।

(খ) ঐ কমিটিতে যোগদানেচ্ছু এশিয়াটিক সোসাইটির সমস্ত সভ্যের কাছে প্রতিটি কমিটির দুয়ার উন্মুক্ত রাখা হবে।

(গ) কমিটিদ্বয়ের যে কোনটিতে সোসাইটির সভাপতি হাজির হলে তিনিই পৌরোহিত্য করবেন; তাঁর অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতিদের মধ্যে একজন ও তাঁদের অনুপস্থিতিতে প্রত্যেক বৈঠকে উপস্থিত সোসাইটির বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য এই ধরণের সভার সভাপতি বলে গণ্য হবেন।

(ঘ) সাহিত্য-সংক্রান্ত কমিটির সম্পাদক হিসেবে কাজ চালানোর জন্য সোসাইটির সম্পাদককে এবং ফিজিক্যাল কমিটির সম্পাদক হিসেবে কাজ চালানোর জন্য এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সম্পাদককে অনুরোধ জানানো হবে।

(ঙ) প্রত্যেক কমিটির জন্য একজন ডেপুটি সেক্রেটারী নিযুক্ত হবেন।

(চ) প্রত্যেক কমিটির সম্পাদকেরা কমিটির ধারা-বিবরণীর বই (Books of Proceedings) রাখবেন।

(ছ) সাধারণভাবে সম্পাদক অথবা সহযোগী সম্পাদকের মাধ্যমে প্রত্যেক কমিটির কাজকর্ম চলবে। কিন্তু যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য তাদের সদস্যদের মধ্যে যে কোন একজনকে বহাল করার ব্যাপারে স্বেচ্ছানুসারে কাজ করার স্বাধীনতা কমিটিগুলির থাকবে।

উক্ত কমিটিদ্বয় যথারীতি বৈঠক ও চিঠিপত্রের আদান প্রদান চালালেও এক সময় অকেজো হয়ে পড়ে। ১৮১৮ খৃঃ ফিজিক্যাল কমিটি পুনরুজ্জীবিত হয় ও অনেক বছর বেঁচে থাকে; কিন্তু এর ধারাবিবরণী পাওয়া যায় না।৫৬ ১৮২৮ খৃঃ ২রা জানুয়ারীর বৈঠকে মোটামুটিভাবে দুটি কারণের—(ক) অত্যন্ত দীর্ঘ বিরতির ব্যবধানে সাধারণ সভার অনুষ্ঠান; ও (খ) আত্মবিশ্বাসের অভাব কিংবা

CENTRAL LIBRARY

অর্থনৈতিক কারণের জন্য এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য হওয়ার অথবা সোসাইটির কাছে নিজেদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফসল তুলে ধরার ব্যাপারে উদগ্রীব ও যোগ্যতা-সম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রতিনিবৃত্তি—পরিপ্রেক্ষিতে ফিজিক্যাল কমিটিকে ফের উজ্জীবিত করে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং স্থির হয় যে

(১) কমিটির ক্রিয়াকলাপ চিকিৎসাশাস্ত্র বাদে প্রাণিবিদ্যা, আবহবিদ্যা, মণিকবিদ্যা ও ভূতত্ত্ববিদ্যার মধ্যে নিবদ্ধ থাকবে।

(২) পনেরোদিনে একবার কমিটি মিলিত হবে।

(৪) সোসাইটির সমস্ত সভাই কমিটির সদস্য হতে পারবেন।

(৪) সোসাইটির সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন ব্যক্তিবর্গ কমিটির যে কোন তিনজন সভ্যের সুপারিশক্রমে সংযোগকারী সদস্য (corresponding members) হিসেবে মনোনীত হবেন।

(৫) পৃথকভাবে প্রকাশনার জন্য এর কার্যবিবরণীর ফলাফল কমিটি প্রস্তুত করবে।৫৭

এশিয়াটিক সোসাইটির কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে সভাপতি হিসেবে স্যার এডোয়ার্ড রায়ান, সহ-সভাপতি হিসেবে জেমস কলভার ও সম্পাদক হিসেবে ক্যাপ্টেন জেন্‌কিন্‌স কর্মকর্তা নির্বাচিত হন। ক্যাপ্টেন জেন্‌কিন্‌সের অসুস্থতায় সম্পাদক হিসেবে কাজ চালানোর জন্য ডি. রসকে অনুরোধ জানানো হয়। একই সঙ্গে সোসাইটির কার্যবিবরণীকে দুভাগে ভাগ করা হয়—(১) ফিজিক্যাল ; ও (২) সাহিত্য সংশ্লিষ্ট। ফিজিক্যাল কমিটির বৈঠক প্রথম বসে ১৮২৮ খৃঃ ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে। ঐ বৈঠকে ডক্টর রস যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। ডক্টর পিডিংটন, গাজীপুরের ডক্টর বাটলার ও মেদিনীপুরের মিষ্টার পিয়ারসন যথাক্রমে ১৮২৮ খৃঃ ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ২৫শে এপ্রিল ও ২০শে অগাস্টের বৈঠকে সংযোগকারী সভ্য নির্বাচিত হন।৫৮ এই কমিটি অনেকদিন জীবিত ছিল ও ফোর্ট উইলিয়ামে Boring operationsএ এবং অন্যান্য গবেষণায় প্রভূত অর্থ ব্যয় করে।৫৯

(৩) উইলিয়াম জোন্সের আমলে যে সুপ্রীম কোর্টের "গ্র্যাণ্ড জুরী রুমে" সোসাইটির সভা বসত তা একটু আগেই আমরা দেখেছি। কিন্তু জোন্সের মহাপ্রয়াণের (২৭শে এপ্রিল, ১৭৯৪ খৃঃ) পরেও এখানে সভার কাজ পরিচালিত হলেও প্রধানতঃ দুটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে—(ক) আদালতের কার্যবৃদ্ধি ও এর

CENTRAL LIBRARY

দরুণ স্থান সংকুলানের অসুবিধে এবং (খ) পরিসরের অভাব হেতু সোসাইটির বই, পুঁথি ও পুরা দ্রব্য সংগ্রহগুলিকে এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদকের বাড়ীতে সংরক্ষণ ও সেগুলির ক্ষতির আশংকা—এশিয়াটিক সোসাইটির জন্য পৃথক আবাস দরকার হয়ে পড়ল।৬০ ১৭৯৬ খৃঃ ২৯শে সেপ্টেম্বরের বৈঠকে ঐ বছরের ১৯শে অগাস্টে গঠিত বিশেষ কমিটি গ্রন্থাগার ও প্রত্নশালার জন্য বাসভবন নির্মাণ এবং তদুদ্দেশ্যে প্রত্যেক নতুন সভ্যের কাছ থেকে ভরতি ফি বাবদ দু মোহর এবং (সম্মানিত সভ্যগণ বাদে) প্রত্যেক সভ্যের কাছ থেকে ফি বছর ত্রৈমাসিক হারে চারটি সোনার মোহর আদায় এবং পুস্তক ও দুষ্প্রাপ্য জিনিস সোসাইটি কর্তৃক ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার প্রভৃতি সুপারিশ করে।৬১ একটি আবাস স্থলের জন্য সোসাইটি সরকারের কাছে যথাক্রমে ১৭৯৬ খৃঃ ও ১৮০৪ খৃঃ আবেদন করে। সোসাইটির দ্বিতীয়বারের আবেদনে পার্ক ষ্ট্রীট ও চৌরঙ্গীর সংযোগস্থলের সরকারী জমি সোসাইটিকে প্রদান করার জন্য সরকারকে সুস্পষ্ট অনুরোধ করা হয়েছিল। ১৮০৫ খৃঃ সরকার আবেদন মঞ্জুর করলেন।৬২ ইতি-মধ্যে সোসাইটি বাড়ী তৈরীর প্রয়োজনীয় টাকা যোগাড় করে। বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারসের ক্যাপ্টেন লক্ একটি নক্সা তৈরী করেন ও সংশোধনের পর সেটি জঁা জ্যাক্স্ পিকন নামে কলকাতায় বসবাসকারী এক ফরাসী গৃহ-নির্মাতার হাতে এশিয়াটিক সোসাইটির বাড়ী তৈরীর জন্য অর্পণ করা হয়। ১৮০৫ খৃঃ মধ্যে উল্লিখিত অঞ্চলে এশিয়াটিক সোসাইটির ভবন নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়।৬৩ ১৮০৮ খৃঃ গোড়ায় সোসাইটি বাড়ীর অধিকার লাভ করে।৬৪

বাড়ী তৈরী সম্পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠাগারের পরিধির দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটে ৬৫ এবং পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা গড়ে তোলার সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়।৬৬

পাঠাগারের ক্ষেত্রে, প্রথমতঃ, প্রতি বছর এমন কি বিশেষ উপলক্ষে বই কেনার জন্য টাকা গচ্ছিত রাখা হয়।৬৭ কেনা গ্রন্থের সংখ্যা বেশী না হলেও পুস্তক নির্বাচন ছিল অত্যন্ত সুচারু এবং ইউরোপে নিযুক্ত সোসাইটির প্রতিনিধি প্রথমে কোলব্রুক ও পরে উইলসনের অক্লান্ত প্রয়াসের ফলে সোসাইটির গ্রন্থ কুটিরের জন্য বিস্তোচিত সংগ্রহ সম্ভবপর হয়। ১৮৩৫ খৃঃ পর্যন্ত সোসাইটির সংগ্রহের উৎস ছিল—(১) সদস্য ও সদস্য নন এমন ব্যক্তিগণ কর্তৃক নিজেদের পুঁজি থেকে সোসাইটিকে উপহার প্রদান এবং (২) ইউরোপ ও আমেরিকার সমস্ত বিশিষ্ট সমিতিগুলির সঙ্গে

CENTRAL LIBRARY

প্রকাশনার ব্যাপারে আদান প্রদান। এশিয়াটিক সোসাইটির সর্বাপেক্ষা মূল্যবান উপহার সংযোজন হল—ম্যাকেঞ্জি (১৮২২ খৃঃ) ও হোম (১৮৩৪ খৃঃ) সংকলন। টিপু সুলতানের অধিকৃত গ্রন্থাগার থেকে সোসাইটি এক বিরাট সংখ্যক পুঁথি উদ্ধার করে (১৮০৮ খৃঃ) ।৬৮

সভ্যরা যাতে এশিয়াটিক সোসাইটির পাঠকক্ষ ব্যবহার করতে পারে তার জন্য নিম্নলিখিত নিয়মাবলী প্রণয়ন করা হল (জানুয়ারী, ১৮২০ খৃঃ) :৬৯

(ক) রবিবার বাদে প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত পাঠাগার খোলা থাকবে ও ঐ সময়ের মধ্যে গ্রন্থগারিক পাঠাগারে হাজির থাকবেন।

(খ) সদস্যরা ছাড়া অন্য কাউকে পাঠাগার থেকে বই নিতে দেওয়া হবে না এবং কমিটি অফ পেপারসের বিশেষ অনুমতি ভিন্ন কলকাতার বাইরে কোন বই যাবে না।

(গ) সম্পাদকের কাছে লিখিত অথবা ব্যক্তিগত দরখাস্ত দেওয়ার মাধ্যমে বই বাইরে নিয়ে যাওয়া চলবে : উভয় ক্ষেত্রেই আবেদনকারীকে একটি লিখিত দরখাস্ত প্রস্তুত করতে হবে : তাতে বইএর নাম ও যে সময়ের জন্য নেওয়া হচ্ছে তা লেখা থাকবে। এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে পর গ্রাহককে হয় বই ফেরৎ দিতে হবে নতুবা তার দেওয়া দরখাস্তের পুর্ননবীকরণ করতে হবে।

(ঘ) বইএর রসিদ পূর্ণ করা হবে এবং কাকে কখন বই দেওয়া হচ্ছে ও বই কখন ফেরৎ আসছে তা লিপিবদ্ধ করা হবে।

(ঙ) গ্রন্থাগারে একটি গ্রন্থ তালিকা ও বাইরে যাওয়া পুস্তকগুলির একটি রেজিস্টার পরিদর্শনের জন্য প্রস্তুত রাখা হবে।

(চ) বইএর নিরাপদ ফেরৎএর জন্য যাঁরা বই নেবেন তাঁরা দায়ী থাকবেন এবং বই নষ্ট অথবা হারিয়ে গেলে তাঁরা ক্ষতিপুরণ দেবেন।৭০

১৮ ২৬ খৃঃ ৬ই সেপ্টেম্বরের বৈঠকে ডক্টর বারলিনি সহযোগী গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থশালার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহকারী হিসেবে নির্বাচিত হন।৭১ ১৮৩৩ খৃঃ সোসাইটির সমগ্র পুস্তকাগারের গ্রন্থ তালিকা প্রকাশিত হয় ; প্রায় এক হাজার খণ্ডের সম্পূর্ণ অংশ এতে স্থান পায়।৭২ ১৮৩৪ খৃঃ ৩০শে জানুয়ারীর সভায় বিগত বছরের (অর্থাৎ ১৮৩৩ খৃঃ) বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করার সময় সোসাইটির সম্পাদক গ্রন্থের উত্তম সংরক্ষার্থে নতুন বই বাঁধানোর জন্য কমিটি অফ পেপারসের

অধীনে, নির্দিষ্ট হারে দফতরি নিয়োগের প্রস্তাব করেন।৭৩ ১৮৩৪ খৃঃ ৩০ শে এপ্রিলের সভায় মিষ্টার ব্যাগশ (BAGSHAW) নামে এক ভদ্রলোক সভ্যদের সুবিধার্থে গ্রন্থাগারের একটি সংশোধিত ক্যাটালগের কথা বলেন এর ভিত্তিতে প্রত্নশালার দর্শনীয় বস্তুসহ একটি নতুন ক্যাটালগ মুদ্রণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।৭৪

দ্বিতীয়তঃ, ১৮১৪ খৃঃ ২রা ফেব্রুয়ারী ডক্টর এন ওয়ালিচ নামে এক ভদ্রলোক সোসাইটির কাছে লেখা একটি চিঠিতে প্রত্নশালা গড়ে তোলার দৃঢ় আহ্বান জানান এবং নিজের সমৃদ্ধ সংগ্রহ থেকে প্রতিলিপি প্রদান ও ঐ সমস্ত পুরাতাত্ত্বিক জিনিসের সংরক্ষণে নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করার অভিলাষ ব্যক্ত করেন। তাঁর স্মারকলিপির ওপর ভিত্তি করে কমিটি অফ পেপারস যে বিবরণী তৈরী করেন তার সারাংশ এখানে উদ্ধৃত হল।

"সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত এ ধরণের কোন পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রহশালার অস্তিত্ব অবর্তমান। এই অবস্থার প্রতিকারে ও প্রত্নশালা গঠনে এশিয়াটিক সোসাইটিকে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানানো হচ্ছে। এই ধরণের লক্ষ্য পুরণ করার মত উপযোগী জায়গা সোসাইটির আছে। সময়ের কিয়দংশ ব্যয় ও এ ধরণের সামগ্রী সংগ্রহে উৎসুক ও সক্ষম ব্যক্তিকে মনোনীত করাই হল সোসাইটির সবচেয়ে বড় অসুবিধে।"

কমিটি অফ পেপারসের প্রতিবেদনানুসারে সোসাইটি আনুষ্ঠানিক ভাবে যে প্রস্তাবগুলি নেয় সেগুলি হল :

১। প্রাচ্য দেশীয় রীতি নীতি ও ইতিহাস ব্যাখ্যায় সক্ষম নিদর্শনাদি গ্রহণের জন্য পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা গড়া হবে ;

২। এ ধরণের প্রকল্প সম্বন্ধে জনগণকে অবহিত করা হবে এবং নিম্নলিখিত ধাঁচের উপহার গৃহীত হবে।

ক) শিলা বা পেতলের লিপি ; (খ) মুসলমান কিংবা হিন্দু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনাবলী ; (গ) হিন্দু মূর্তির অবয়ব ; (ঘ) প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ; (ঙ) প্রাচ্যের যুদ্ধাস্ত্র ; (চ) প্রাচ্যের বাদ্যযন্ত্র (ছ) ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত পাত্র ; (জ) মূল্যবান ধাতু : (ঝ) ভারতের অভ্যন্তর কংকাল : (ঞ) সংরক্ষিত বা শুকনো জানোয়ার ; (ট) সংরক্ষিত বা শুকনো পাখী : (ঠ) প্রতিটি ধরণের ধাতু প্রভৃতি ;

CENTRAL LIBRARY

৩। এশিয়াটিক রিসার্চেসের প্রতি খণ্ডের শেষে সোসাইটির গ্রন্থশালা ও পাঠাগারে যাঁরা সাহায্য করছেন তাঁদের নাম প্রকাশিত হবে ;

৪। লব্ধ সামগ্রীর অভ্যর্থনার জন্য একতলার হলঘর মানানসই করা হবে ;

৫। কমিটি অফ পেপারস্, এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক ও যাঁর তদারকের ওপর গ্রন্থশালার ভার অর্পিত হবে তিনি নিজে এই ধরণের প্রকল্প ও প্রকল্পের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করবেন।

৬। ডক্টর ওয়ালিচকে নিজে থেকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেবার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হবে।

৭। ডক্টর ওয়ালিচকের সাহায্য গৃহীত হবে এবং তাঁকে পরে সোসাইটির প্রাচ্য সংগ্রহশালার পরিচালক হিসেবে নিয়োগ করা হবে।৭৫

এইভাবে গ্রন্থশালা ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। ইতিমধ্যে ক্যালকাটা গেজেটে উপহার দেবার মত জিনিস পাঠাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়।৭৬ উপরিউক্ত বস্তু সমূহের শিরোনামায় সমস্ত সাহায্য নেওয়া হয় ও সেগুলির সংরক্ষণের জন্য অবাধে অনুদান (grants) বরাদ্দ করা হয়।৭৭ ১৮১৫ খৃঃ ৫ই এপ্রিলের বৈঠকে ডক্টর ওয়ালিচের নির্দেশে সোসাইটির গ্রন্থশালার জন্য যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং মিস্টার উইলিয়াম লয়েড গিবন্স্ (যিনি ছিলেন একাধারে সোসাইটির সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক) ডক্টর ওয়ালিচের সঙ্গে যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক (curator) হিসেবে কাজ করার জন্য অনুরুদ্ধ হন।৭৮ ১৮২০ খৃঃ মধ্যে গ্রন্থশালার জন্য গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি হল :

১। গ্রন্থশালায় দাতব্য সামগ্রীর রেজিষ্টারকে সোসাইটির প্রতিটি বৈঠকে প্রদর্শন করা হবে।

২। সংগ্রহশালার সমস্ত দ্রব্যের সম্পূর্ণ ক্যাটালগ তৈরী ও ক্যাটালগে রেফারেন্সের যথাযথ চিহ্ন প্রত্যেকটি দ্রব্যের ওপর এঁটে দেবার জন্য ডক্টর ওয়ালিচকে কমিটি অফ পেপারস সত্বর অনুরোধ জানাবেন।৭৯

ডক্টর ওয়ালিচের পদত্যাগের পর মিষ্টার গিবন মাসিক ৫০ টাকা বেতনে তত্ত্বাবধায়ক পদে যোগ দেন। কিন্তু ভূতত্ত্ব ও প্রাণিবিদ্যায় প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব ও প্রদেয় পারিশ্রমিকের স্বল্পতা গ্রন্থশালার বিকাশে বিঘ্ন ঘটায়। ১৮২৮ খৃঃ

CENTRAL LIBRARY

ফিজিক্যাল কমিটির নিযুক্তি সোসাইটির ক্রিয়াকলাপে যে নতুন শক্তি সঞ্চার করে তা-ই পরে মাসিক ১৫০ টাকা বেতনের তত্ত্বধায়ক মিষ্টার হিচিন্‌সের (Hichins) নিয়োগে (১৭ই জুন, ১৮২৮ খৃঃ) পরিণতি লাভ করে। তিন বছর পর তাঁর বংশধর মাসিক ২০০ টাকা বেতনে ঐ পদে বহাল হন।৮০ ১৮৩২ খৃঃ ১৫ই জানুয়ারীর বৈঠকে সোসাইটির গ্রন্থাগার উন্নয়ন কল্পে ডক্টর পিয়ারসনের একটি সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সোসাইটির সভাপতি, সম্পাদকবর্গ ও ছয়জন সভ্যকে নিয়ে গঠিত কমিটি ১৮৩২ খৃঃ ৩রা অক্টোবরে যে প্রতিবেদন পেশ করে তাতে সোসাইটির গৃহে একজন আবাসিক তত্ত্বাবধায়কে (Resident Curator) পক্ষে স্থায়ী ভাবে বসবাসের বন্দোবস্ত করার অসুবিধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এবং সোসাইটির সন্নিহিত পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নমুনাদির বিষয় সমূহ সংরক্ষণের জন্য একটি ছোট বাড়ী ভাড়া করা এবং সোসাইটির বাড়ীর একতলার সম্পূর্ণ অংশ ঐগুলির অভ্যর্থনার জন্য উন্মুক্ত রাখার কথা ঐ রিপোর্টে বলা হয়। এই ব্যবস্থায় ব্যয় মাসাপিছু ২০০ টাকা ধরা হয়। আলোচনার পর এই ধরণের ব্যয় সংকুলানের উপযোগী আর্থিক সঙ্গতি সোসাইটির আছে কিনা তা অনুসন্ধান করার জন্য রিপোর্টটি উক্ত কমিটির কাছে ফেরৎ দেয়া হয়।৮১

সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল অর্থের। প্রথম বারো বছর সোসাইটির কোন তহবিল বা বৈতনিক সভ্য ছিল না। ফলে সোসাইটির কাজ চালানোর রাহা খরচ যোগাতেন হয় সভাপতি নয়তো সম্পাদক কিংবা উভয়েই।৮২ এমন কি জোন্সের পরলোকগমনের পরেও সভ্যদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করার ব্যবস্থা নেওয়া হলেও আর্থিক সংকট আমাদের আলোচিত যুগের (১৭৮৪_১৮৩৪ খৃঃ) মধ্যে সম্পূর্ণভাবে লাঘব করা যায়নি। এই আর্থিক সংকট অনেকটা "ডেমোক্লিসের খাঁড়ার" (Sword of Democles) মত এশিয়াটিক সোসাইটির ওপর ঝুলছিল। টাকার এই ঘাটতির প্রভাব একাধিক দিকে বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছিল।

(ক) আর্থিক সংস্থানের অভাবের ফলে ১৭৮৭ খৃঃ পর্যন্ত ফি-বছর এশিয়াটিক মিসেলানীর ৮৩ (Asiatick Miscellaney) প্রকাশনার (যা উইলিয়াম জোন্সের ইচ্ছা ছিল) ব্যাপারে হাত দেওয়া যায়নি। অবশেষে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মুদ্রণ দফতরের ম্যাথুয়েল ক্যাণ্টোফার নামে জনৈক ভদ্রলোক ১৭৮৮ খৃঃ বেসরকারী উদ্যোগে এশিয়াটিক সোসাইটির ক্রোড়পত্র মুদ্রণে সম্মত হন; তবে তাঁর

CENTRAL LIBRARY

আরোপিত শর্ত ছিল এই : সোসাইটির প্রত্যেক সদস্য কপি পিছু ২০ টাকা দরে প্রতি খণ্ড কিনবেন। সোসাইটির সাময়িক পত্রের নতুন নাম রাখা হল "এশিয়াটিক রিসার্চেস" ; এর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডগুলি যথাক্রমে ১৭৮৮, ১৭৯০, ১৭৯৩, ১৭৯৫ ও ১৭৯৭ খৃঃ প্রকাশিত হয়।৮৪ হিন্দু দেবদেবী, পুরাণ, জ্যোতির্বিদ্যা, পুরাতত্ত্ব, ভারতীয় কৃষি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণামূলক নিবন্ধ এশিয়াটিক রিসার্চেসে স্থান লাভ করে।৮৫ সাহিত্যের জগতে "এশিয়াটিক রিসার্চেস" এত দ্রুত জনপ্রিয়তা ও সমাদর লাভ করে যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এমন কি ইংলণ্ডে [কলকতার এশিয়াটিক সোসাইটির বিনানুমতিতে] এশিয়াটিক রিসার্চেসের নতুন সংস্করণ ১৭৯৮ খৃঃ বের হয়। ইতিমধ্যে প্রতি কপির মূল্য ১৬ টাকায় হ্রাস করা হয়।৮৬

১৭৯৬ খৃঃ ২৯শে সেপ্টেম্বরের বৈঠকে সভ্যদের কাছ থেকে ত্রৈমাসিক চাঁদা আদায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৯৮ খৃঃ মধ্যে সোসাইটির তহবিলে কিছু অর্থাগম হয় ; ৮৭ এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৯৮ খৃঃ ৩রা মে সোসাইটি নিম্নলিখিত তিন দফা কার্যসূচী নেয় :

(১) এখন থেকে সোসাইটির ট্রানস্যাকসনস্ সোসাইটির ব্যয়ে ও সোসাইটির অর্থের অংশরূপে প্রকাশিত হবে।

(২) প্রেসের তদারকি ও এশিয়াটিক সোসাইটির অধিকতর সুবিধার্থে ভারতে এশিয়াটিক সোসাইটির ট্রানস্যাক্সন্স্ প্রকাশিত হবে ; খুঁটিনাটি সহ প্রকাশন পদ্ধতি পরিচালনভার আগের মত কমিটি কফ্ পেপারসের হাতে ন্যস্ত করা হবে।

(৩) সোসাইটির প্রস্থাপি প্রকাশনার ব্যয় নির্বাহের উপযোগী অর্থ কোষাধ্যক্ষের কাছ থেকে তুলতে কমিটি অফ পেপারস্ অধিকারী হবেন ; এবং কমিটির সংখ্যা-গরিষ্ঠ সদস্যদের স্বাক্ষরিত এক নির্দেশনামা (order) কোষাধ্যক্ষকে ঐ টাকাটা চুকিয়ে দেবার ব্যাপারে পর্যাপ্ত কারণ হবে।৮৮

১৭৯৯ খৃঃ ১০ই জানুয়ারীতে অপর একটি ঘোষণায় বলা হল :

(১) DESIDERATAর আলোকে যে সমস্ত প্রাচ্য বিষয় বিবেচিত হবে সেগুলির একটি তালিকা এশিয়াটিক রিসার্চেসের প্রতিটি খণ্ডের সঙ্গে প্রকাশ করা যথাযথ হবে ; সোসাইটির সভ্য কিংবা অন্যান্যদের এশিয়াটিক সোসাইটির

কাছে দাখিল করা তালিকা থেকে কমিটি এই ধরণের প্রাচ্য বিষয়ের তালিকা তৈরী করবেন।

(২) DESIDERATA হিসেবে মনোনীত বিষয়গুলির ওপর সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধাদির উৎকর্ষের প্রশংসাপত্র হিসেবে লেখককে রিসার্চেসের খণ্ড উপহার দেওয়া হবে যেখানে এই ধরণের প্রবন্ধ এবং সেই সঙ্গে সোসাইটির নামে সম্পাদকের লেখা একটি সৌজন্যমূলক পত্র (complimentary letter) অন্তর্ভুক্ত থাকবে।৮৯

ইতিমধ্যে সদস্যদের কাছ থেকে সংখ্যা পিছু ১২ টাকা আদায়ের ব্যবস্থা হয়। ছয় থেকে বারো খণ্ড এই বন্দোবস্ত অনুযায়ী মুদ্রিত হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থাও লাভজনক ছিল না। মুদ্রণ ছিল ব্যয় বহুল এবং বিক্রয়লব্ধ আয় ছিল ব্যয়ের চেয়ে অনেক কম। ১৮১৯ খৃঃ গৃহীত প্রস্তাব : লণ্ডনের এক প্রকাশকের কাছে এশিয়াটিক রিসার্চেসের গ্রন্থস্বত্ব বিক্রী এবং রচনাবলীর অল্প-বিরতির মধ্যে প্রকাশন —বানচাল হয়ে যায়। ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানগুলির পদাঙ্ক অনুসরণ করে শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় যে এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যদের কাছে এশিয়াটিক রিসার্চেস মাগনা (gratis) হিসেবে দেয়া হবে। এই বন্দোবস্ত সোসাইটির ট্রানস্যাকসন্‌সের প্রকাশনাকে অধিকতর বিলম্বিত করে। ১৮২৯ খৃঃ এশিয়াটিক রিসার্চেসকে বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধাবলী সংক্রান্ত —এই দুভাগে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং আমাদের আলোচিত যুগের (১৭৮৪-১৮৩৪ খৃঃ) মধ্যে ১৭ (১৮৩২ খৃঃ) ও ১৮ (১৮৩৩ খৃঃ) খণ্ডে রিসার্চেস প্রকাশনার মাধ্যমে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হয়।

এশিয়াটিক রিসার্চেসের বিশাল কলেবর গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ও চিন্তাধারা-নির্ভর সংক্ষিপ্ত অথচ পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধের পক্ষে অনুকূল ছিল না। এগুলি পরে ডক্টর উইলসনের Quarterly Oriental Journal (১৮২১ খৃঃ প্রকাশিত) ও Transactions of the Medical and Physical Societyতে স্থান লাভ করে। ১৮২৭ খৃঃ উভয় পত্রিকার প্রকাশন বন্ধ হয়ে যায়। তখন উক্ত প্রবন্ধাদি নির্গমের মাধ্যম হল ডেপুটি সারভেয়র জেনারেল ক্যাপ্টেন জে. ডি. হারবার্টের পরিচালনা-ধীন "Gleanings in Science" নামে একটি পত্রিকা (১৮২৯ খৃঃ) ; এই পত্রিকার মধ্যে দিয়ে সোসাইটি এত বেশী উপকৃত হয় যে এতদিন পর্যন্ত পাণ্ডু-লিপিতে আবদ্ধ সোসাইটির ধারাবিবরণীর (Proceedings) সারাংশ উক্ত

CENTRAL LIBRARY

পত্রিকায় নিবদ্ধ করতে সোসাইটি উৎসাহিত হয়। ১৮৩০ খৃঃ মিস্টার জেমস্ প্রিন্সেপ্ "Gleanings in Science" নাম পরিবর্তন করে "The Journal of the Asiatic Society" করার সুপারিশ করেন।৯০ তাঁর প্রস্তাব কার্যকরী হয় এবং ১৮৩২ খৃঃ ৭ই মার্চের বৈঠকে ঠিক হয় যে "...Permission be granted to be continued as long as the publication is under the charge of one or both the Secretaries of the Society."৯১ ১৮৩২ খৃঃ মার্চে এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্র হিসেবে যে জার্ণাল আত্মপ্রকাশ করল তার নাম হল "Journal of the Asiatic Society of Bengal". এই পত্রিকা "এশিয়াটিক রিসার্চেস" কেও অতিক্রম করল এবং সোসাইটির রসদ সংকুচিত করল কারণ সভ্যদের জন্য পত্রিকা প্রকাশনার ব্যয় বহন করার পর রিসার্চেসের মুদ্রণ খরচ যোগানোর মত খুব অল্প পুঁজিই সোসাইটির কাছে সঞ্চিত রইল।৯২

(খ) অর্থাভাবে প্রাচ্য সাহিত্যের মুদ্রণ ও ভাষান্তর, সংস্কৃত পুঁথির সংরক্ষণ এবং গ্রন্থশালার সম্প্রসারণের কাজ দুষ্কর হয়ে পড়ে। প্রথমতঃ, ১৮০৫-০৬ খৃঃ শ্রীরামপুরের মিশনারীরাই সর্বপ্রথম এশিয়াটিক সোসাইটি ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সহযোগিতায় জোন্স প্রকল্পিত প্রাচ্যসাহিত্যের অনুবাদে অগ্রণী হন।৯৩ কমিটি অফ পেপারসের সুপারিশক্রমে সোসাইটি তিন বছরের মধ্যে নির্বাচিত গ্রন্থ "রামায়ণে"র কাজ শেষ করার শর্তে মাসিক ১৫০ টাকা মিশনারীদের অনুদান দিতে প্রতিশ্রুত হয়। ১৮০৭ খৃঃ ৭ই অক্টোবরে সাংখ্যের টেকসট বইকে অনুবাদের দ্বিতীয় গ্রন্থ হিসেবে বাছাই করা হয় এবং মাসিক বরাদ্দ প্রথম তিন বছর উত্তীর্ণ হবার পরেও ১৮ মাসের জন্য অব্যাহত রাখা হবে এই মর্মে এক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু রামায়ণের প্রথম তিন খণ্ডের প্রকাশনার পর অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দেয়া হয়। ১৮০৬ খৃঃ ২রা জুলাই স্থির হয় যে "Asiatic Society resolved to publish, from time to time, as their funds will admit of it, in volumes distinct from the Asiatic Researches, translations of short works in the Sanskrit and other Asiatic languages, or extracts and descriptive accounts of books of greater length in those languages, which may be offered to the Society and appear deserving of publication." কিন্তু (১৮৩৪ খৃঃ মধ্যে ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক প্রাচ্য সাহিত্যের প্রকাশনায় সাময়িক অর্থ সাহায্য দান ছাড়া) উক্ত লক্ষ্য পুরণের জন্য সোসাইটি কোন ব্যবস্থা নেয় নি।৯৪

১৮২৮ খৃঃ ৩রা সেপ্টেম্বরের সোসাইটির কার্যবিবরণী (Proceedings) থেকে জানা যায় যে প্যারিসের রয়াল লাইব্রেরীর Cataloguedes Manuscripts এ যেমন ভিন্ন রচনার সারাংশ (মূল গ্রন্থের প্রচুর উদ্ধৃতি এমন কি অনুবাদ সহ) সংকলিত আছে, তেমন ধরণের এক প্রকল্প এশিয়াটিক সোসাইটি বহু বছর আগেই উদ্ভাবন করে।৯৫ সংস্কৃত পুঁথির ক্যাটালগ তৈরী করার জন্য সোসাইটি ১৮০৭ খৃঃ ১লা জুলাই তারিখে ইংরেজ সরকারের কাছে ৫ থেকে ৬ হাজার টাকা বাৎসরিক সাহায্য দেবার যে আবেদন জানায় তাতে এই মর্মে বলা হয় যে—"On every consideration, the Asiatic Society is desirous of forming a collection as well as of obtaining a detailed catalogue, of manuscript. But the funds of the Society are too limited for the undertaking : and, without aid, either the design must be relinquisthed, or, if it be prosecuted, a progress answerable to public expectations cannot be looked for...." কিন্তু সরকারের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য সাড়া না পাওয়ায় এবং টাকার ঘাটতির দরুণ পরিকল্পনাটি ভেস্তে যায়।৯৬

তৃতীয়তঃ, ১৮৩৪ খৃঃ বাৎসরিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে : (ক) অর্থের অপ্রতুলতার ফলে গ্রন্থশালার সম্প্রসারণ প্রকল্প অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে, কারণ একতলার ঘরগুলিকে নতুন করে চত্বরে পরিণত না করা পর্যন্ত সম্প্রসারণের কাজে নিয়োজিত করা যাবে না। (খ) ১৮৩৩ খৃঃ জুলাই মাসে মিস্টার পিয়ারসনকে বিনা বেতনে গ্রন্থশালার তত্ত্বাবধায়কের পদ (office of gratuitous Curator) গ্রহণ করতে রাজী করানো হয় এবং একজন সহযোগী তত্ত্বাবধায়ককেও একই সঙ্গে নিযুক্ত করা হয়।৯৭ প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বহিরাগতদের ওপর প্রবেশ মূল্য ধার্য করে তাদের গ্রন্থশালা পরিদর্শনের অধিকার দিয়ে গ্রন্থশালাকে আয়ের উৎস হিসেবে পরিণত করার ব্যাপারে ১৮৩৩ খৃঃ সোসাইটির জনৈক সভ্যের দাবী সভ্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নাকচ করে দেয়।৯৮

সোসাইটির এই পৌনঃপৌণিক আর্থিক দুর্গতির কারণ কি ? (ক) ১৭৯৬ খৃঃ ২৯শে সেপ্টেম্বরে নতুন ও অন্যান্য সভ্যদের কাছ থেকে ভর্তি ফি ও প্রতি বছরে ত্রৈমাসিক হারে চাঁদা তোলার এবং সেই সঙ্গে সোসাইটির কোন সদস্য আধ বছর ধরে চাঁদা বকেয়া রাখলে তাকে সোসাইটির সভ্য হিসেবে গণ্য না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও (৯৯) সভ্যরা নিয়মিত চাঁদা দিতেন না এবং এর দরুণ সময়ে সময়ে

অনাদায়ী টাকার পরিমাণ হয়ে দাঁড়াত বিরাট।১০০ দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। এশিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালের (২য় খণ্ডের) মুখবন্ধের (Preface) ভাষ্য অনুযায়ী ৩২০ জন চাঁদাদাতা সভ্যের (Paying subscribers) ৭০ জন ও সেই সঙ্গে আরো অনেকের প্রচুর চাঁদা বাকী পড়ে ; এর দরুণ সোসাইটির হাতে উদ্বৃত্ত বাবদ ১৩২১-৮ টাকা আসার কথা।১০১ ১৮৩৪ খৃঃ সোসাইটির জার্ণালে (৩য় খণ্ডের) প্রদত্ত বাৎসরিক প্রতিবেদনেও একই ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। ঐ প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে যে' যেখানে (প্রবেশ ফি বাদে) ৮০জন সদস্যের কাছ থেকে ৫১২০ টাকা চাঁদা হিসেবে আদায় হবার কথা ; সেখানে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩৯০০ টাকা। ঐ রিপোর্টে অবশ্য এই আশা করা হয়েছে যে "...**An attempt has been made, though it is not yet matured to introduce the option of compounding for the quarterly subscriptions, and...this measure, if adopted, will prove more productive to our finances and more convenient and agreeable to most of the members. It will also save the expence and delay of collection.**"১০২

(খ) সভ্যদের তরফ থেকে অনিয়মিতভাবে চাঁদা দেওয়া ছাড়াও গ্রন্থশালা ও পাঠাগারের জন্য সোসাইটির ব্যয় বর্ধিত হয়। এছাড়া পামার অ্যাণ্ড কোম্পানী দেউলিয়া হলে সোসাইটির যেটুকু সঞ্চয় ছিল তাও বাষ্পীভূত হয়। অর্থাভাবে ক্লিষ্ট সোসাইটি এই সময় দুটি জায়গা থেকে আর্থিক সাহায্য পায়। ১৮২৯ খৃঃ অযোধ্যাধিপতি ২০,০০০ টাকা ও তাঁর প্রধানমন্ত্রী ৫,০০০ টাকা সোসাইটিকে দান করেন।১০৩ ১৮৩২ খৃঃ মিস্টার ক্রস নামে সোসাইটির একজন প্রাক্তন সদস্য মোটা অংকের অর্থ সোসাইটির হাতে তুলে দেন ও সেই অর্থ কোম্পানীর কাগজে (Government securities) বিনিয়োগ করা (invested) হয়।১০৪ কিন্তু **Messrs Mackintosh and Co.** নামে যে কোম্পানী ঐ অর্থের ভারপ্রাপ্ত ছিল সেই কোম্পানী দেউলিয়া হলে এশিয়াটিক সোসাইটির **Cash balance** ফুরিয়ে আসে।১০৫

(গ) এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক ১৭৯৮ খৃঃ এশিয়াটিক রিসার্চেস প্রকাশনার ব্যয়ভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণের দরুণ সোসাইটির তহবিল যে নিঃশেষিত হয়ে আসে (১০৬) তার নিদর্শন, সোসাইটির নেটিভ সেক্রেটারী রামকমল সেনের

১৮৩৩ খৃঃ এক স্মারকলিপি। ঐ লিপি অনুসারে রিসার্চেসের মুদ্রণ বাবদ সোসাইটির ব্যয় হয়েছে ৮২,০০০ টাকা; কিন্তু সেখানে বিলেত ও ভারতে রিসার্চেসের বিক্রী বাবদ মোট উঠেছে ৯২০০ টাকা; অর্থাৎ ৭২,৮০০ টাকা সোসাইটির লোকসান হয়েছে। এই অবস্থার প্রতিকারে রামকমল সেন প্রকাশনা স্থগিত অথবা তার দায়িত্বভার লণ্ডনস্থ এক প্রকাশকের হাতে ন্যস্ত করার প্রস্তাব দেন।১০৭ সমস্ত আস্থা পর্যালোচনার জন্য গঠিত একটি বিশেষ কমিটি রামকমল সেনের সুপারিশ নাকচ করে দেয়। ঐ কমিটি এই মর্মে রায় দেয় যে "The present income of the Society is Sr. Rs. 400 per mensem : out of which at least 100 Rupees may be set apeart to cover printing expences, and this in the three years usually devoted to each volume will be ample for plates as well as letter press. But as every measure of economy is called for, under existing circumstances, we strongly recommend that the ootavo form be substituted for the quarto volume."১০৮

সূত্রনির্দেশ

১. David Kopf, British Orientalisim and Bengal Renaissance chapts I—2 [এখন থেকে D. K. বলে উল্লিখিত হবে]

২. S. N. Mukherjee Sir William Jones pp. 77-78. [এখন থেকে শুধুমাত্র Mukharjee বলে উল্লিখিত হবে।

৩. Asiatick Researches—vol 1, p.x. (এখন থেকে As. R. বলে উল্লিখিত হবে।)

৪. Centenary Review of the Asiatic Society of Bengal (pt. I) [এখন থেকে শুধুমাত্র C. R. বলে উল্লিখিত হবে] by R. L. Mitra p I-2.

৫. প্রাগুক্ত, p. 4-6.

৬. D. K,p.16.

৭. C, R, p. 8.

৮. (ক) ঐ চারজন ভারতীয় পণ্ডিতের নাম গোবর্দ্ধন কাউল, পণ্ডিত রামলোচন, রাধাকান্ত শর্মা ও আলি ইব্রাহিম খাঁ, As. R, vol. I। (খ) Mukherjee, p.-164. পাদটীকা।

৯. C. R, p.8 (খ) Report of the Regional Records Survey Committee (1952-53) [এখন থেকে R. R. R. S. C. বলে উল্লিখিত হবে] An Account of the Asiatic Socity (1808-1851) by S.P. Sen.

১০. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২১৭, ২১শে মার্চ ১৮২৯।

১১. R,R.R.S.C. প্রাগুক্ত।

১২. (ক) Jones, Works, vol I, p.6. (খ) C.R. p. 6-7.

১৩. As, R, vol. VI. Appendix, pp. 595-600

১৪. C.R, p. 6-7.

১৫. বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের পণ্ডিত ব্যক্তিদের (যেমন ভিয়েনার হ্যামার ; ব্যারণ সিলভেস্তার, ডি, সোসি এবং অন্যান্যদের) এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মানিত সদস্য হিসেবে আজীবন সদস্য মনোনীত করা হত। এর জন্য এঁদের কোন চাঁদা দিতে হত না। এঁদের নির্বাচন হত চলিত রীতির (Practice) ভিত্তিতে সুনির্ধারিত কোন নিয়মানুসারে নয়। (ক) R,R,R.S,C, প্রাগুক্ত, (খ) C,R, P.10,

১৬. As. R. vol. I p.VII and VIII (খ) Mukherjee. p.81-90.

১৭, C. R. p.11.

১৮. C. R. p.10

১৯. R.R.R.S.C. প্রাগুক্ত।

২০. C.R.p.20-21.

২১. D.K. প্রাগুক্ত p. 697-1.

২২. তদেব।

২৩। C.R. p-13.

২৪. As. R. vol.VI (Appendix), 595-600.

২৫. C. R. p-7।

২৬. D.K. প্রাগুক্ত, p.69-71.

২৭. C.R. p.13-14 ; 85 (Appendix)

২৮. তদেব p.15.

২৯. As. R. vol. VI, p-595-600. (Appendix).

৩০. R.R.R.S.C. প্রাগুক্ত।

৩১. তদেব।

৩২. তদেব।

৩৩. Gleanings in Science (এখন থেকে Gl. Sc. বলে উক্ত হবে) vol 3 p. 260.

৩৪. তদেব, p.90-92.

৩৫. C.R. p.17-19.

৩৬. Mukherjee, p.81-90.

৩৭. C.R. p.17-19.

৩৮. প্রাগুক্ত।

৩৯. প্রাগুক্ত।

৪০. প্রাগুক্ত।

৪১. As R. vol. VII. p. 509.

৪২. C.R. p. প্রাগুক্ত।

৪৩. C.R. p.20.

৪৪. R.R.R.S.C প্রাগুক্ত।

৪৫. As. R vol. VI. p-595-600 (Appendix).

৪৬. C.R. p.17-19.

৪৭. প্রাগুক্ত।

৪৮.(ক) C.R. p. 20 (খ) eg Sc. vol. I, p.59.

৪৯. Asiatic Journal and Monthly Register (এখন থেকে As. J. বলে কথিত হবে) vol. 28, 1829, July-December p.217.

৫০. R.R.R.S.C. প্রাগুক্ত।
৫১. (ক) প্রাগুক্ত। (খ) C R. p.20.
৫২. Journal of the Asiatic Society of Bengal (এখন থেকে J.A.S.B. নামে পরিচিত হবে) vol. 3, 1834 Annual Report p. 49-52.
৫৩. R.R.R.S.C. প্রাগুক্ত।
৫৪. C.R. p.15.
৫৫. As. R. vol. 12, 1816 p-7-9. (Appendix),
৫৬. C.R. p.16.
৫৭. As, R. vol. 16. 1828 Appendix.
৫৮. Gl. Sc. vol. I.p. 20-24.
৫৯. C.R. p.16.
৬০ (ক) যোগেশ চন্দ্র বাগল, কলিকাতা সংস্কৃতি কেন্দ্র, প্রবন্ধের শিরোনাম বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি, এখন থেকে যো. চ. বা. ব. এ. সো. বলে উক্ত হবে। (খ) C.R.p.
৬১. As. R. vol. 6. p. 595-600 (Appendix)
৬২. (ক) যো. চ. বা. প্রাগুক্ত। (খ) C. R.p.
৬৩. D. K. প্রাগুক্ত p-69-71.
৬৪. C.R.P
৬৫. R.R.R.S.C. প্রাগুক্ত।
৬৬. C.R. p. 31-32.
৬৭. C.R. P.
৬৮. R.R,R.C. প্রাগুক্ত।
৬৯. C.S. P.
৭০. As. R. vol. 16 (Appendix).
৭১. As. J. vol. 23 1827Janury-Jun-p.507.
৭২. C.R. p.
৭৩. J.A.S,B. vol. 31834 p. 49-52.
৭৪. প্রাগুক্ত, p.193.

৭৫. C.R.P. 31-34.

৭৬. R.R.R.S.C. প্রাগুক্ত।

৭৭. C.R. P.প্রাগুক্ত।

৭৮. As. R. vol. 12 1816 Appendix,P. 5-9.

৭৯. As. R. vol. 13 1820 Appendix,

৮০. C.R.-P-প্রাগুক্ত।

৮১. J.A.S.B. vol. 1832 p.363-364, 472.

৮২. C.R. p.71.

৮৩. মুখ্যতঃ বিদগ্ধ ব্যক্তিদের মৌলিক প্রবন্ধাবলীর সংকলন সোসাইটির ভাবী মুখপত্র 'এশিয়াটিক মিসেলানী'র অঙ্গীভূত করাই জোন্সের মূল লক্ষ্য ছিল Jones, Works vol. I. p.6.

৮৪. C.R. P. 47.

৮৫. যো. চ. বা.-র. এ. সো।

৮৬. C.R. p.47,

৮৭. C.R. p-48.

৮৮. As. R. vol. VI, (1799) p. 595-600 Appendix.

৮৯. তদেব।

৯০. C.R. p. 49-51.

৯১. J.A.S.B. vol. I, 1832 p. 116.

৯২. C.R. p-49-51.

৯৩. D.K. প্রাগুক্ত 69-71.

৯৪. C.R. p.55-56.

৯৫. As. J. vol. 27January-June 1829 p. 452.

৯৬. C.R. P. 67-68.

৯৭. J. A. S. B., vol. 3, 1834 p. 49-52.

৯৮. J.A.S.B. vol. 2, 1833 p. 323-324.

৯৯. As. R. vol. VI 1799 p.প্রাগুক্ত Appendix

১০০. R.R.R.S.C. প্রাগুক্ত।

১০১. J.A.S.B. vol. 2, 1833 Preface p. 5-10.

১০২. J.A.S.B. vol. 3, 1834 p.49-52.

১০৩. C.R. P. 71

১০৪. J.A.S.B. voll, 1832 p 116.

১০৫. C.R. p.71.

১০৬. প্রাগুক্ত।

১০৭. J.A.S.B. Vol. 2, 1833 p. 149-50.

১০৮. প্রাগুক্ত. p-323-324.

CENTRAL LIBRARY

উনিশ শতকে দামোদর উপত্যকায় নিম্নবিত্ত মানুষের আর্থিক অবস্থা।

কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে আমাদের দেশের নিম্নবিত্ত লোকেদের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা নিরূপণের জন্য ভারতের বিদেশী শাসকগণ সরকারীভাবে এক গোপন তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই প্রতিবেদন থেকে দামোদর উপত্যকা অঞ্চলের কৃষি নির্ভর অধিবাসীদের বিশেষ করে সাধারণ নিম্নবিত্ত শ্রেণীর লোকেদের, আর্থিক অবস্থার কথা বিস্তারিতভাবে জানা যায়। এই সমীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতের মোট জনসংখ্যার অধিকাংশই যে প্রকট দারিদ্র্য ও অনাহারে দিনাতিপাত করে তার সত্যতা নির্ণয়, কোন শ্রেণীর লোক এই পর্যায়-ভুক্ত তা স্থির করা এবং তাদের দারিদ্র্য দূরীকরণের পন্থা নির্ণয়।

দামোদর উপত্যকায় বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া ও দক্ষিণ বিহারের ছোটনাগপুর, মালভূম প্রভৃতি স্থানের সমীক্ষায় প্রকাশিত সমগ্র অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর বিশেষ করে কৃষি নির্ভর স্বল্প আয়ভুক্ত সাধারণ মানুষের অর্থ-নৈতিক দুরবস্থার একটী বাস্তব চিত্র পরিস্ফুট হয়। সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যের কারণস্বরূপ বলা হয় নিম্ন দামোদর অঞ্চলের বন্যা ম্যালেরিয়া ও মহামারী ঋণগ্রস্থতা বাল্যবিবাহ, সামাজিক ও ধর্ম্মীয় কারণে অনুৎপাদক ব্যয়ের প্রবণতা। এছাড়া আছে অশিক্ষা, কুসংস্কার, কর্মসংস্থানের অভাব, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সীমিত কৃষির উপর চাপ সৃষ্টি প্রভৃতি। উচ্চ উপত্যকার বিহার অঞ্চলে ভূমি সংস্কারের অভাব বাল্যবিবাহ, মজুরির নিম্নহার, কর্মসংস্থানের অভাব ইত্যাদি ও অন্যতম কারণ বলে অভিহিত। উচ্চ বর্ণে যাঁরা ভদ্রলোক শ্রেণীভুক্ত তাঁদের দারিদ্র্যের কারণ হিসাবে বলা হয়েছে—কায়িক শ্রমের কাজে অনীহা, বেহিসাবী চিন্তাধারা, মামলাবাজী, পঞ্চমকার সংক্রান্ত দোষাবলী ইত্যাদি।

সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত সাধারণ মানুষের জীবনের মান

বলে তখন কিছু ছিল না বরং তারা অল্পেতেই তুষ্ট থাকত। শুধু দুটি খেতে পেলেই যেন যথেষ্ট। উচ্চাকাঙ্খা বা দূরদর্শিতার কোন বালাই এদের ছিল না। নিরক্ষর, ধর্মভীরু ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশে যুগ যুগ ধরে দারিদ্র্যের চাপে ক্লিষ্ট ভাগ্যকে তারা আঁকড়ে থাকে। প্রচণ্ড খরা ও অজন্মার ফলে কিছু কিছু লোক দেশ থেকে দেশান্তরে কর্মের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। ফলে সমর্থ পুরুষ যারা দেশান্তরে চলে গেল তাদের পোষ্যবর্গ বিশেষ করে স্ত্রীলোক ও শিশুরা অর্থাভাবে সহায়, সম্বলহীন ও আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে এরকম উদাহরণও বিরল নয়।(১) আরার ভূমিহীন শ্রমিক যারা পরিবারসহ দেশান্তরী হয়েছে, চুক্তি অনুযায়ী চাবাগান ক্ষেতে খামারে কাজ করতে করতে প্রবাসেই তারা জীবন কাটিয়েছে।

দামোদর উপত্যকা অঞ্চলের মধ্যে নিম্ন অঞ্চলেই সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভাল ছিল। বিশেষ করে রেলপথের প্রবর্তন, খনি, কল-কারখানা ও কলকাতার প্রত্যক্ষে নিকটবর্তী অঞ্চলের নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে কর্মসংস্থানে যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি নিম্ন-শ্রমিকদের কর্মে স্থিতিবস্থাও এনে দিয়েছে। বৃষ্টিতে যেমন ছয় ঋতুর সময় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় নিম্নে সেই অঞ্চলে সারা বছরই কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকে। ফলে শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের আর্থিক অবস্থা কৃষি-নির্ভর শ্রমিকের অপেক্ষা ভাল ছিল।

নিম্ন দামোদর অঞ্চলের বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর অঞ্চলে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রথম দারিদ্র্যের লক্ষণ প্রকটিত হয়।২ ১৮৮১ সালের আদম সুমারীর সমীক্ষায় দেখা যায় কৃষিতে সারা বছর কর্মসংস্থানের সুযোগ হয় না বিশেষ করে কোন কোন মরশুমে দিনে একবার মাত্র খাওয়া জোটে এবং কর্মসংস্থানের অভাবে ভূমিহীন শ্রমিক প্রচণ্ড দারিদ্র্যের কবলে পড়ে। ক্রমাগত দারিদ্র্যের চাপে পড়ে অনেকেই আসামের চাবাগানে কুলিগিরী করতে চুক্তিবদ্ধ হয়ে দেশ ছেড়ে চলে যায়। মেদিনীপুর জেলায় তখন বছরে ছয় মাস কর্মসংস্থানের সুযোগ হোত। অন্য সময়ে সাধারণ শ্রমিকেরা দলে দলে কলকাতায় কর্মের সন্ধানে চলে যেত। সেই সময় মাত্র দশ শতাংশ লোক দিনে একবার খেতে পেত।

হুগলী জেলার কালেকটর টয়েনবী সাহেব তাঁর অনেকদিনের অভিজ্ঞতা থেকে ঐ জেলা সম্বন্ধে যে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন, তা থেকে জানা যায় হুগলী জেলার লোকেদের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল ছিল। হুগলী ও বালির মধ্যে

CENTRAL LIBRARY

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত বেলকুলি গ্রাম, দামোদর নদের পূর্ব পাড়ে অবস্থিত নবীনা প্রজাপতিপুর গ্রাম, মাজপুর এবং পিণ্ডরা গ্রাম। দামোদরের পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত এবং প্রায় প্রতি বছরই দামোদরের বন্যায় প্লাবিত গ্রামসমূহ যথা—রাজপুর গোপালদহ, তাঁতীশালী, বউখেজালী ইত্যাদি স্থানে নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের আর্থিক অবস্থার অনুসন্ধান করা হয়। শ্রীরামপুর মহকুমার এস. ডি. ও সাহেব সরেজমিনে তদন্ত করে খরসরাই অঞ্চলের তাঁতীদের অবস্থা অনুসন্ধান করে জানান যে এই অঞ্চলের তাঁতীরা ম্যাঞ্চেষ্টারের মিলের কাপড় ভারতের বাজার গ্রাস করলে প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

সাধারণভাবে উপরিউক্ত সমীক্ষার বিবরণে প্রকাশ ঐসব অঞ্চলের নিম্নশ্রেণী লোকেদের অনেক রেল কোম্পানী, পাটকল বা অন্যান্য শিল্পে কোন না কোন কর্মসংস্থান খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু ঐ অঞ্চলের সবচেয়ে দুর্ভাগা ছিল তাঁতী শ্রেণী। ইংলণ্ডের মিলের কাপড় ভারতে রপ্তানী হতে থাকায় দেশের তাঁতীদের বাজার নষ্ট হয় ফলে মন্দা বাজারে বেকারত্বের প্রসার ঘটে। তাঁতী সম্প্রদায় প্রচণ্ড দারিদ্র্যের কবলে পড়েও পিতৃপুরুষের পেশায় তাঁতের কাজ ছেড়ে অন্য পেশা গ্রহণ করার মানসিকতা তাদের ছিল না। এদের মধ্যে যারা বাস্তব অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম তারা অবশ্য কৃষিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছে যদিও তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। যাইহোক, ঐ অঞ্চলে নিম্নশ্রেণীর লোকদের কর্মসংস্থানের কিছু কিছু সুযোগ থাকলেও ঋণের দায় থেকে কেউ মুক্তি পায়নি। ঋণগ্রস্থ হবার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে এরা ছিল অশিক্ষিত এবং এদের ছিল সামাজিক ও ধর্মীয় কারণে পারিবারিক অনুষ্ঠানে বেশী ঋণ করার প্রবণতা। ফলে তাদের আয়ের বেশীর ভাগ কোনদিন হাসপাতালে যায়নি। শিশু ও স্যালেখরা ও পরের বছর বন্যা হবেই এই অঞ্চলের ঐতিহ্য দেখা দেয়। বাঁকে হুগলী, বিহারীনাথ অঞ্চলের দিনমজুর শ্রেণীর লোকেরা কাজের খোঁজে যায়। এদের মধ্যে তাঁতী সম্প্রদায়ের লোকই ছিল বেশী

CENTRAL LIBRARY

পয়সা আয় করত । ফলে দৈনিক একবারের মতও তারা আহার জোটাতে সক্ষম হোত না ।(৩)

হাওড়া জেলার প্রশাসক রিচি ব্যক্তিগতভাবে অনুসন্ধান করে বলেছেন হাওড়া জেলার যে অংশ কলকাতার কাছাকাছি সেখানকার সাধারণ মানুষের অবস্থা গ্রাম বাংলার মানুষের অবস্থার চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । ঐ অঞ্চলের যে কোন সমর্থ পুরুষ মাসে সাত টাকা আয় করার মত কর্মসংস্থানের সুযোগ পেত । উদাহরণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেছেন বাউরিয়া কটন মিলের প্রসঙ্গ । সেখানে একজন অদক্ষ শ্রমিক মাসে সাত টাকা পর্যন্ত রোজগারের সুযোগ পেত । আশেপাশের গ্রাম থেকে তখন বহুলোক কলে কারখানায় কাজ জুটিয়ে নিত । বালকদের মজুরি ছিল আড়াই টাকা এবং সমর্থ লোকেদের মাসে প্রায় নয় টাকার মত রোজগারের সুযোগ থাকত । এ ছাড়া শিল্পাঞ্চলের বাইরে জল নিকাষণের জন্য মাটি কাটার কাজ, চাষবাসের জন্য জমির কাজে কিছু কিছু কর্মসংস্থানের সুযোগও পাওয়া যেত । হাওড়া জেলায় ঐ সময়ে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ মাইলে ১১০০ জন হলেও ঐ অঞ্চলে রাজাপুর খাল খননের সময় বিহারের নিম্নশ্রেণীর লোকেদের দ্বারা মাটি কাটার কাজ সম্পন্ন করতে হয় । ঐ অঞ্চলে নূতন নূতন কলকারখানা রেলপথ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কর্মসংস্থানের সুযোগ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় । গ্রামাঞ্চলের লোকেদের আর্থিক অবস্থা নিরূপণের জন্য ঐ জেলার ডেপুটি কালেকটর দামোদর ও রূপনারায়ণ নদের মধ্যবর্তী অঞ্চলে সরেজমিনে অনুসন্ধান করেন । ঐ অঞ্চলের শ্যামপুর গ্রামটি বেছে নেওয়া হয় । গ্রামটি কলক তার ধনী সীল পরিবারের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হলেও তাঁরা কখনও গ্রামে যেতেন না । উপরন্তু গ্রামটি জনৈক অবস্থাপন্ন কৈবর্তকে পত্তনী দেওয়া হয় । ঐ গ্রামে কৈবর্ত শ্রেণীর লোকেদের প্রায় ১৯২টি পরিবার বাস করত । তারা খুব পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী ও চাষবাসে দক্ষ ছিল । পত্তনীদারের খাজনার তালিকায় ১৯২টি পরিবারের মধ্যে ১১০ জনের নাম উল্লেখ ছিল বলে জানা যায় । ঐ গ্রামে পুরোহিত, ধোপা নাপিত ও অল্প সংখ্যক ভূমিহীন শ্রমিক বাস করত ।

সাধারণভাবে বলতে গেলে ঐ অঞ্চলে জনমজুরির হার শস্যক্ষেত্রে কাজের জন্য প্রতিদিন দশ পয়সা, ঘর ছাওয়ার জন্য তের পয়সা আর ঘর বানানোর জন্য পনের ষোল পয়সা নির্দিষ্ট ছিল । শ্যামপুর গ্রামের ৪/৫ জন লোকের উপযুক্ত রায়ত

CENTRAL LIBRARY

পরিবারের মোট ১৫ বিঘা পরিমাণ জমি থাকলেই একটি পরিবারের ব্যয় সঙ্কুলান হোত বলে মনে করা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে কয়েকটি পরিবারের জমি ও ব্যয় নির্বাহের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় পরিবারের স্ত্রী ও পুরুষ যদি কায়িক শ্রমে একান্তই বিমুখ না হয় তবে মহাজনের ঋণ ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ পূর্বক তাঁরা স্বচ্ছল-ভাবে বাস করতে পারত। শ্যামপুর গ্রামের অধিবাসীরা কায়িক শ্রমে অভ্যস্থ হওয়ায় ডেপুটি কালেকটর মনে করেন শ্যামপুর থানার অন্যান্য গ্রামের থেকে এই গ্রামের অধিবাসীরা প্রায় সকলেই স্বচ্ছলতার অধিকারী। সেজন্য এই গ্রামটিকে অন্যান্য গ্রামের থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করা হয়।

দামোদর নদের বাম তীরে বাগনান থানার মাধবপুর গ্রামের অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। গ্রামটি ১৮৮৫ সাল দামোদর নদের বন্যায় ভেসে যায় এবং ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই গ্রামের অধিবাসীরা ছিল চণ্ডাল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বন্যার কবলে পড়ে গ্রামবাসীরা কেউই খাজনা দিতে সক্ষম হয় না। এই গ্রামে চাষের মধ্যে ধান চাষই ছিল প্রধান। আটচল্লিশটি পরিবারের মধ্যে মাত্র তিন-জনের ১৫ বিঘার উপর জমি ছিল। যদিও এ অঞ্চলটি ছিল প্রচণ্ডভাবে বন্যাপীড়িত এবং শ্যামপুর গ্রামের তুলনায় এই অঞ্চলের সাধারণ শ্রমিকের আর্থিক অবস্থা ভাল না হলেও এদের ছোট ছিমছাম মাটির কুঁড়ে ঘরগুলিতে কিছু কিছু পিতলের বাসনের সমারোহ লক্ষ্য করা গেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য এই গ্রামে তখনও দারিদ্র্যের লক্ষণগুলি প্রকট হয়ে ওঠে নি।

বর্ধমান জেলার কলেকটর মিঃ ওল্ডহাম যে বিবরণ পেশ করেছেন তাতে জনপ্রতি মাসিক সাত টাকা আয় অথবা সমপরিমাণ আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুসন্ধান করা হয়েছে। বর্ধমান জেলার চাষী ও কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে প্রভেদ করা খুবই মুস্কিল।(৪) কারণ ওখানে এমন কোন চাষী ছিল না যাদের জমি ১২ বিঘার কম এবং সেখানে এমন কোন কৃষি শ্রমিক খুঁজে পাওয়া যেত না যাদের একটু বাস্তু ও কাঠা দশেকের আন্দাজ বাগান করার মত জায়গা অথবা উৎপাদিত ধানের অংশ পায় না। এ ছাড়া শ্রমিক শ্রেণীতে পড়ে কয়লাখনির শ্রমিক, গুড় উৎপাদনের জন্য দিন মজুর রেল কোম্পানীতে নিযুক্ত শ্রমিক, সোনা-বাড়ীতে কর্মরত শ্রমিক, শকট চালক, নৌকার মাঝি এবং ফাই ফরমাশ খাটার লোকজন। তবে কয়লাখনিতে নিযুক্ত শ্রমিক সবচেয়ে বেশী উপায় করে। তারা

যেমন খেতে পায় বেশী তেমনি মদ্যপানেও খুব আসক্ত। এই অঞ্চলের শ্রমিকদের বিশেষত্ব হচ্ছে এদের সবল স্বাস্থ্যের জন্য পরিশ্রম করতেও তারা খুব অভ্যস্ত ছিল। তাদের গড় আয় মাসে প্রায় আট টাকা এবং সারা বছরই তারা কর্মে নিযুক্ত থাকে।

বর্ধমান জেলার লোকেদের মধ্যে নানারূপে রোগের প্রকোপ পরিলক্ষিত হয়। এর মধ্যে ম্যালেরিয়া এবং প্লীহা সংক্রান্ত জ্বর খুবই প্রকট। কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার কুষ্ঠ রোগাক্রান্তও লক্ষ্য করা হয়। এই অঞ্চলের লোকেদের মধ্যে ঋণের বোঝা প্রায় দেখা যায় না বললেই হয়। রেল লাইনের ব্যাপক সম্প্রসারণ ও সেই সঙ্গে অন্যান্য শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধিহেতু মজুরি ও বাড়তে শুরু করে। গৃহস্থ বাড়ীর মেয়েরা বা শিশুরা কেউই ঘরের বাইরে কোন কাজে নিযুক্ত হয় না। বরং তারা বাড়ীর ভিতরে নানারূপ শ্রমের কাজ করে থাকে। সেই সময় এক সাধারণ পরিবার যেটুকু আয় করত তাতেই তাঁদের সমগ্র পরিবারের খাদ্য, পোষাক এবং নানাবিধ সামাজিক ও ধর্মানুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান হোত। তখন পরিবারের সবচেয়ে দুর্দ্দশাগ্রস্থ ব্যক্তি ছিল—অসহায় প্রৌঢ় এবা প্রৌঢ়া।

কাকশা অঞ্চলে ১৮৮১ থেকে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত যে ভয়ানক ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয় তাতে দেখা যায় ৬৯৩টি বাড়ীতে ৩৭৩০ জন লোক বাস করে। আদম সুমারী অনুযায়ী এই পরিস্থিতিতে ৪২৭টি বাড়ী বিনষ্ট ও ১৯২৫ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যারা বেঁচে রইল তাঁরা আবার রুগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে প্লীহার অসুখে আক্রান্ত হলেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে রুগ্ন লোকের দিন মজুরিও অর্ধেক হ্রাস পায়। সাধারণত : ১৮৫০ সালে এই অঞ্চলের কৃষি শ্রমিকের দৈনন্দিন মজুরি ছিল পেটভরে খাওয়া ও চার সের ধান। বছর তিরিশেক পরে শ্রমিকের মজুরি কিছু বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ খাওয়া ও পাঁচ সের ধান মজুরি রূপে নির্দ্দিষ্ট হোল। তখন কিন্তু ধানের দাম দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্ধমান জেলায় উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ থেকে নিম্নবর্ণের হাড়ি সম্প্রদায় পর্যন্ত সকলেরই কিছু না কিছু জমি জায়গা ছিল এবং নিদেনপক্ষে যাদের আক্ষরিক অর্থে জমি ছিল না তারাও কৃষির মাধ্যমেই জীবিকা অর্জন করতো।৫ হাণ্টার সাহেব ১৮৭২ সালে যে বিবরণ পেশ করেন তাতে বলা হয়েছে বর্ধমান অঞ্চলে মানুষের স্বচ্ছলতার প্রভাবে ঋণের দায়ে বন্ধ হওয়ার ঘটনার পরিসমাপ্তি হয়। ৬

CENTRAL LIBRARY

গ্রামের মহাজনী কারবারও তখন অদৃশ্য হয়ে যায়। অবশ্য একমাত্র জমি বন্ধক রেখে অর্থের লেনদেন চলত এবং তাও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। খরার সময় জমির মালিক তাঁদের মজুরদের বিনা সুদে খাদ্যশস্য ধার দিয়ে সাহায্য করত।

কারিগর শ্রেণীর মধ্যে কামার কুমার ছুতোরদের অবস্থা কিন্তু বরাবরই বেশ স্বচ্ছল ছিল। পিতল ও লোহার শ্রমিকদের মাসিক আয় ছিল প্রায় ছয় টাকা। তাঁতীরাও অবশ্য কাজ পেলে, অনুরূপ আয় করতে পারতো কিন্তু তাদের পুরোমাস কাজ জুটত না। তবে শ্রমিকের বাজার তখন যতই মন্দা হোক না কেন দিনে দশ পয়সার রুজি তারা তখন নিয়মিত পেত।

১৮৬৬ সালে বর্ধমান অঞ্চলে পর পর দুটি শস্যের ক্ষতি হলে এবং পরে প্রচণ্ড খরা দেখা দিলে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। যদিও এই অঞ্চল অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে অধিকতর সমৃদ্ধ তবুও ঐ সময়ের দুর্ভিক্ষ কমিশনের বিবরণে প্রকাশ দিন মজুরেরা দুর্ভিক্ষের সময় দলে দলে শহরে এসে ভীড় করে এবং ভবঘুরের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। বর্ধমানের মহারাজা অন্নসত্র খুলে প্রতিদিন হাজার বারশ লোককে অন্নদান করেছেন।৭

বাঁকুড়ার কালেকটর টেইলার সাহেব নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক অবস্থা নিরূপণের জন্য বাঁকুড়ার দুটো গ্রামকে বেছে নিয়েছিলেন। তারমধ্যে একটি বাঁকুড়া সদর থানা ও অপরটি বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত।

এই অঞ্চলে বেশীর ভাগ লোকেই নিরক্ষর সেজন্য আয় ব্যয়ের হিসাবও কেউ রাখত না। নিম্ন আয়ভুক্ত লোকদের মধ্যে তিনটি শ্রেণী লক্ষ্য করা যায়—যথা কৃষক, কৃষিতে ও অন্যান্য কাজে নিযুক্ত শ্রমিক এবং কারিগর শ্রেণী। কারিগর শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে পেশাগত সম্প্রদায় যথা তাঁতী, কামার কুমার, ছুতোর, স্বর্ণকার প্রভৃতি। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে আছে বৈষ্ণব ফকির ও ভিখিরি ইত্যাদি পরমুখাপেক্ষী সম্প্রদায় যাঁরা অপরের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল।

সদর মহকুমার যে গ্রামটিকে নির্বাচন করা হয় তার নাম নড়া। এখানে দশটি চাষী পরিবারের বাস। প্রতিটি পরিবারে গড়ে আটজন লোক—এদের মধ্যে দুজন পুরুষ দুজন স্ত্রীলোক এবং চারজন শিশু। প্রতি পরিবার পাঁচ একর জমি চাষ করে সাধারণ ভাবে ২৩০ মণ বা প্রতি একরে ৪৬ মণ ধান ও ১৬ কাহন

CENTRAL LIBRARY

খড় পেত। এই গ্রামের কেউ পুকুরের মালিক ছিল না। সম্পত্তির মালিকানা উচ্চবিত্তদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বনজঙ্গল থেকে নিম্নবিত্ত আয়ের লোকেরা জ্বালানী বা ঘরবাড়ী তৈরী করার সামগ্রী সংগ্রহ করত। নিম্নবিত্ত লোকেরা উচ্চবিত্তদের বাড়ীতে জনমজুরের কাজ করে কিছু কিছু উপার্জন করত। এইভাবে নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকদের বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ ছিল ১২ টাকা। চাষী পরিবারের নিজেদের গরু ছিল। স্ত্রী লোকেরা পুরুষদের সঙ্গে মাঠে কাজ না করলেও ঘর গৃহস্থালীর কাজ, শস্য ঝাড়াই, ধানকুটা, শস্য মজুত রাখা বা প্রয়োজনে গরু চরানোর কাজ করে পুরুষদের সাহায্য করত। বালকেরা রাখালের কাজ করত। খরা বা অতিবর্ষণ না হলে কৃষির আয় থেকে কোনমতে কৃষি পরিবারের দুবেলা দুমুটো গ্রাসাচ্ছাদন হত। যদি বিবাহ, হালের গরু কেনা বা শস্যের ক্ষতি হোত তবে ঋণ করা ছাড়া অন্য কোন গত্যন্তর ছিল না।

নড়া গ্রামে উনিশ জন শ্রমিক পরিবারের বাস ছিল। প্রতি পরিবারে গড়ে পাঁচ জন লোক। তাদের কোন জমি ছিল না। দৈনিক মজুরি প্রসঙ্গে জানা যায় দুই আনা পুরুষ এবং স্ত্রীমজুর ছয় পয়সা রোজগার করত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের অর্থের পরিবর্তে শস্য দেওয়া হোত। চাষের মরশুমের সময় তাঁরা পুরো-পুরি কাজ পেত কিন্তু অন্য সময়ে তাঁদের কর্মসংস্থানের অভাবে একবেলা অনাহারে থাকতে হত। খরা বা অনুরূপ কারণে যদি ফসল ভাল না হোত তবে তারা পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলিতে কাজের সন্ধানে বেড়িয়ে পড়ত এবং ধানকাটা শেষ হলেই গ্রামে ফিরে আসত। বাউরি, ডোম ও বাগ্দীরাই এই পর্যায়ে পড়ে এবং ওদের অবস্থাই সবচেয়ে দুর্দ্দশাগ্রস্থ ছিল। কৃষি শ্রমিকরা মাটির ঘর, দেওয়াল, বাঁশের ঝুড়ি প্রভৃতি তৈরী করত। স্ত্রী মজুরেরা জঙ্গল থেকে জ্বালানী সংগ্রহ করে নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে বিক্রয় করত। আসামের চাবাগানের কুলি হিসাবেও এইসব অধিবাসীরা সংগৃহীত হত।

এছাড়া এখানে মোট এগার জন দক্ষ কারিগরের বাস ছিল। এদের মধ্যে চারজন তাঁতী, দুজন কামার, একজন স্বর্ণকার, দুইজন ছুতোর, একজন নাপিত ও একজন মালাকার বাস করত। প্রতি পাঁচজনের তাঁতী পরিবারের সর্বসাকুল্যে আয় ছিল আশী টাকা। ঐ সময়ে ম্যাঞ্চেষ্টারের আমদানীজাত বস্ত্র শহর অঞ্চলকে

CENTRAL LIBRARY

ব্যাপক গ্রাস করায় স্থানীয় তাঁতের বাজারে মন্দা আসে ফলে গ্রামাঞ্চলেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

প্রতি কামার পরিবারে জনসংখ্যা ছিল দশজন। কামারশাল এদের বংশানুক্রমিক জীবিকা। এদের পরিবারের আয়ও ছিল ভাল। অনুরূপভাবে ছুতোর স্বর্ণকারদের আয়ও বেশ ভালো ছিল। সেই অনুপাতে নাপিত ও মালাকারদের আয় ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। এমনকি মাঝে মাঝে কাজের অভাবে এদের ঋণ করে চালাতে হত।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকেরা গান গেয়ে ভিক্ষা করে দিন যাপন করত। এদের জীবন যাত্রায় ধর্মীয় সংস্পর্শ থাকায় সমাজে এই সম্প্রদায় বিশেষ সমাদৃত হত।

বিষ্ণুপুরের যে গ্রামটিকে নির্বাচন করা হয় তার নাম রাধানগর। এখানে ১৫০ চাষী পরিবার ৪০ জন শ্রমিক এবং ২৫ জন দক্ষ কারিগর বাস করত। চাষী পরিবারের জমির পরিমাণ ছিল গড়ে দুই একর। প্রতি একর জমিতে প্রায় ২০ মণ ধান হত। প্রতি পরিবারের আয় ছিল বছরে সাত টাকা।

কৃষি শ্রমিকের বিভিন্ন ধরণের কাজ করতে হত এবং বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য বিভিন্ন হারে মজুরি দেওয়া হত। একজন শ্রমিক দৈনিক গড়ে দশ পয়সা আয় করত যা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। শ্রমিকদের পাওনা সব সময়ে নগদ অর্থে দেওয়া হত না। বিশেষ করে যাদের কাছে প্রচুর শস্য থাকত তারা অর্থের বদলে শস্য দিতেই অভ্যস্ত ছিলেন।

কামার, কুমোর, তাঁতী, ছুতোর এদের মধ্যে তাঁতী সম্প্রদায় ছাড়া অন্যান্য সকলে মোটামুটি ভালোই ছিল। সারা বছরই তাঁদের কর্মসংস্থান হোত। কুমোরদের বাড়ীর মেয়েছেলেরাও পুরুষদের পেশায় সাহায্য করত। এই সম্প্রদায়ের পরিবারে লোকসংখ্যাও কম ছিল। এদের পরিবারে গড়ে দুজন পুরুষ, একজন স্ত্রীলোক ও তিনজন শিশু। রাধানগর গ্রামে প্রায় কুড়িজন ভিখারীর বাস ছিল এবং তারা সম্পূর্ণভাবে অপরের দয়ার উপর নির্ভর করত।

বর্ধমান জেলার ঢোলা, দুর্গাপুর, বেলিয়া এবং গাঙ্গমুড়ি গ্রামের লোকেদের পেশা, সম্পত্তি, দায় দায়িত্ব ও জীবিকার উৎস প্রভৃতি অনুসন্ধান করা হয়। এই সব গ্রামের অধিবাসীরা সাধারণভাবে চাষী, কৃষি শ্রমিক, সাধারণ শ্রমিক, কারিগর এবং বাউল, বৈরাগী, ফকির প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এছাড়া শারীরিক অক্ষমতার জন্য অপরের উপর নির্ভরশীল কিছু ব্যক্তিও ছিল। প্রাথমিকভাবে দেখা

CENTRAL LIBRARY

যায় এই অঞ্চলে চাষী পরিবারের জমির আয়তন যেমন বেশী তেমনি তাদের পরিবারও ছিল ছোট। যদি নিয়মিত কর্মসংস্থান হোত তবে শ্রমিক শ্রেণীরও মোটামুটি উপার্জন হত। শ্রমিকদের আয় ও ব্যয় হিসাব করলে দেখা যাবে আয়ের অনুপাতে ব্যয় বেশী। ১৮৮৭ সালে এই অঞ্চলে অধিক শস্য উৎপাদিত হলেও ১৮৮৪ এবং ১৮৮৫ সালের খরাজনিত পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়নি। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠান, অসুখ বিসুখ প্রভৃতি উৎপাদন বহির্ভূত ব্যয় নির্বাহ নিমিত্ত ঋণ করার দরুণ সাধারণ শ্রেণীর লোকের দুঃখ দুর্দ্দশার কখনও অবসান হত না। ঢোলা গ্রামের রায়তদের জমির পরিমাণ বেশী হলেও ঋণের বোঝা কম ছিল না। ঢোলা গ্রামের ত্রিশজন চাষী পরিবারের আঠারটি পরিবারই ছিল ঋণগ্রস্থ। অনুরূপভাবে অপর চারটি গ্রামের প্রায় ত্রিশ শতাংশ চাষী পরিবারই দেনার দায়ে বদ্ধ ছিল।

এই অঞ্চলে কৃষি শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুসন্ধান করে জানা যায় যে বেশীর ভাগ কৃষি শ্রমিক রায়তদের গৃহে বাঁধা শ্রমিকের কাজেই নিযুক্ত। চাষের কাজে তাদের বছরের পর বছর নিয়োগ করা হত। চাষবাস দেখাশুনা, তদারকী করার জন্য শ্রমিকদের উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশ দেওয়া হোত। শ্রমিকদের চাষের মরশুমের পুর্বে আগাম খাদ্যশস্য দেওয়া হোত এবং চাষের পরে হিসাব অনুযায়ী শতকরা পঁচিশ শতাংশ তাদের অংশ থেকে সুদ হিসাবে কেটে নেওয়া হত। খুব অল্প সংখ্যক কৃষি-শ্রমিকই ঋণ থেকে মুক্ত ছিল। তখনকার দিনে ঐ অঞ্চলের একজন শ্রমিকের জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্যয় হত বছরে প্রায় চব্বিশ টাকা। ঢোলা গ্রামে লক্ষ্য করা গেছে কৃষি শ্রমিকের পরিবারে লোকসংখ্যা যেখানে গড়ে পাঁচজন সেখানে চাষী পরিবারের জনসংখ্যা গড়ে মাত্র তিনজন। গাঙ্গমুড়ি গ্রামের কৃষি শ্রমিক শ্রেণীর প্রায় অর্ধেকেরই আড়াই একর জমি ছিল। অবশ্য অন্য গ্রামে তা ছিল না। তবুও গাঙ্গমুড়ি গ্রামের প্রায় চল্লিশ শতাংশ কৃষি শ্রমিকই কৃষক পরিবারের কাছে ঋণে আবদ্ধ ছিল।

সাধারণ শ্রমিক যারা ঘর তৈরী করে, জিনিষপত্র বহন করে এবং অন্যান্য কাজকর্মে অভ্যস্থ তারাও কৃষিকর্মের অতিরিক্ত চাহিদা মেটাতো। সাধারণভাবে একজন শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ছিল রোজ দশ পয়সা। তোলা গ্রামের সাধারণ শ্রমিক দশ পয়সার বেশী মজুরি পেত না এবং সারা বছর নয় মাসের বেশী তাদের

CENTRAL LIBRARY

কর্মসংস্থানও হোত না : স্বর্ণকার, কর্মকার, ছুতোর, তাঁতী, কুমোর প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরা বংশানুক্রমে নিজেদের পেশায় নিযুক্ত থাকার ফলে এই সম্প্রদায়ের কাজের অভাব হোত না। ঢোলা গ্রামে প্রতিটি দক্ষ কারিগরের পঁচিশ থেকে ত্রিশজন বাঁধা খরিদ্দার ছিল। নিজ পেশার বাইরে তাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু জমিজমা ছিল। সুতরাং তাদের অবস্থা রায়তদের চেয়ে কোন অংশেই খারাপ ছিল না। তথাপি এই সম্প্রদায়ের শতকরা পঞ্চাশ জন ঋণগ্রস্থ ছিল।

বিহারের অন্তর্ভুক্ত দামোদর নদের উচ্চ উপত্যকা অঞ্চলের প্রধান সমস্যা ছিল মজুরির নিম্ন হার। যদিও উপত্যকার মধ্যাঞ্চলে কয়লাখনি ও রেলপথের প্রসারের ফলে নূতন নূতন কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ ঘটে তবুও উচ্চ উপত্যকার গ্রামাঞ্চলের আদিবাসী ও নিম্নশ্রেণীর সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। প্রসঙ্গতঃ মানভূম অঞ্চলের কথাই ধরা যাক। একদিকে সাঁওতাল পরগণা এবং অপরদিকে বর্ধমান ও বাঁকুড়ার সীমানা এই অঞ্চলকে ঘিরে রেখেছে। ঐ অঞ্চলে কয়লাখনি ও রেলপথ বিস্তার লাভ করায় নূতন নূতন কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশ পাহাড় জঙ্গল ও আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল। এ ছাড়া বাকী অংশে কৃষি ও জনবসতিপূর্ণ স্থান। রায়তদের জমির পরিমাণ বেশী হলেও ভূমির মান খুব নিম্ন হওয়ায় উৎপাদনের পরিমাণ বেশী ছিল না। এই অঞ্চলে রায়তদের জাতি বা বর্ণভেদ জীবন ও জীবিকার উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। সাঁওতাল অথবা ভূমিজ স্বাভাবিকভাবে কৃষি কাজ ছাড়া মুরগী শুকর বা অন্যান্য পশুপক্ষী পালন এবং বিক্রয়ের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করত। কিন্তু কোন হিন্দু রায়ত উদাহরণস্বরূপ বলা যায় একজন গোয়ালা বা রাজপুত অথবা একজন তেলী ধর্মীয় সংস্কারবশতঃ কখনও মুরগী বা শুকর ছাগল অথবা মেষপালন করে জীবিকা নির্বাহ করত না। এই অঞ্চলে ঋণগ্রস্থ লোকের সংখ্যা ছিল সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় তিন ভাগ। এই পরগণার একটি প্রচলিত প্রবাদ—"লোকে চাষ করে মহাজনের জন্য"।

রায়তদের আমন ধান চাষের উপরই বিশেষভাবে নির্ভর করতে হত। চাষের উৎপাদন থেকে জমির খাজনা, কর, মহাজনের ঋণ পরিশোধ, নূতন ঋণের জন্য আগাম অর্ধেক শস্য দিয়ে যেটুকু শস্য পাওয়া যেত তাতে একজন রায়ত পরিবারের মাত্র চার মাস চলত। বাকী আট মাসের ব্যয় নির্বাহের জন্য পুনরায় মহাজনের

CENTRAL LIBRARY

দ্বারস্থ হতে হোত। চৈত্র মাস থেকে খরা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রায়তদের আর্থিক অবস্থাও খারাপ হতে থাকত। অনেক নিম্নবিত্ত পরিবারের লোক মহুয়া কেন্দু ফল খেয়ে ভাদ্রমাস পর্যন্ত কাটাতো। পরে ভাদ্রের আউশ ধান, ভুট্টা, মরুয়া প্রভৃতি ফসল উঠলে তবে পুনরায় কার্তিক মাস পর্যন্ত তাদের কোনমতে চলে যাবে বলে আশা করা হোত। চৈত্র মাস থেকে ভাদ্র মাস হচ্ছে দারুণ সঙ্কটপূর্ণ সময়। এই সময়ে রায়তদের অনেকের দুবেলা অন্ন জুটতো না। তার উপর যদি প্রকৃতি অকরুণ হোত তবে তো কথাই নাই। দারিদ্র্যের চরমতম অবস্থা তখন দেখা দিত।(৯)

লোহারডগা জেলার দুই ভাগে একটি অঞ্চল রাঁচী মালভূমি যা আসল ছোটনাগপুর বলে পরিচিত, অপর দিকে মানভূম ও রাঁচীর মধ্যবর্ত্তী পরগণা পালামৌ অঞ্চল। প্রথমোক্ত অঞ্চলের আদিবাসী শ্রেণীর লোক চা বাগানের কুলিগিরির জন্য আসাম, ডুয়ার্স জলপাইগুড়ির উদ্দেশ্যে পাড়ি দিত। কিন্তু পালামৌয়ের লোকদের অবস্থা খুবই দুর্দ্দশাগ্রস্থ ছিল। আদিবাসীরা দূরদেশে যাতায়াত অভ্যস্থ ছিল বলে চা বাগানের কাজ ছাড়াও অন্যান্য স্থানে এমনকি দেশান্তরে যেতেও পিছপা হত না। চা বাগানের সর্দার শ্রেণী লোকেরা দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে এসে কুলিদের নিয়োগ করত এবং অর্থ ও রাহা খরচ দিয়ে তাদের কর্মক্ষেত্রে নিয়ে যেত। এইভাবে দেখা যায় যদিও কিছু দুর্নীতিপরায়ণ অসাধু সর্দারদের হাতে পড়ে অনেক অজ্ঞ ও নিরীহ মানুষের প্রাণান্ত হয়েছে তবুও সৎপরিবেশে যে সব মানুষ বিদেশে গিয়েছে তাদের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে বছরে স্ত্রী পুরুষ ও শিশু সহ দশ হাজার লোক বিদেশে কাজ করে প্রায় লক্ষ টাকা সঞ্চয় করে দেশে ফিরে এসেছে।১০ স্থানীয় কৃষিক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সঙ্কুলান না হলেও আসাম ও অন্যান্য বাগানে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা থাকায় ছোটনাগপুরের আদিবাসী সম্প্রদায়ের একদিকে যেমন দারিদ্র্যভার লাঘব হয়েছে অপরদিকে কৃষিক্ষেত্রের উপর চাপও হ্রাস পেয়েছে। খনি অঞ্চলে এবং নিম্নাঞ্চলে কৃষিক্ষেত্রে ধান রোপন ও কর্ষনের সময়ও এই সব আদিবাসী সম্প্রদায় প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করেছে। ফলে আরও একটি সুফল পাওয়া গেছে। বহির্দেশ থেকে অর্থ অর্জিত হওয়ায় স্থানীয় জমিদার বা মহাজনদের অত্যাচার থেকে তারা রেহাই পেয়েছে। ছোটনাগপুর অঞ্চল

CENTRAL LIBRARY

থেকে বছরে প্রায় পঁচিশ হাজার শ্রমিক বিদেশে কর্মসংস্থানে বেরিয়ে পড়ে। এইভাবে চা বাগানে খনিতে নিম্নাঞ্চলে রেল লাইন সম্প্রসারণের সঙ্গে সাধারণ শ্রমিকের কর্মসংস্থানেরও বহুবিধ সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

উপরোক্ত অঞ্চলের লোকদের ঋণের কারণ সম্পর্কে বেকার সাহেব উদাহরণসহ বলেন ঋণের বোঝা প্রয়োজনের তুলনায় ঋণ গ্রহীতার আর্থিক অবস্থার উপরই বিশেষ ভাবে নির্ভর করে ; যেমন একটি গ্রামে দেখা যায় সাতাশটি পরিবারের মধ্যে বিশজনই ঋণগ্রস্থ এবং তাঁদের সকলেই কৃষি পরিবারভুক্ত। ঋণের পরিমাণ নগদ তিন টাকা থেকে চল্লিশ টাকা, সাড়ে সাত মণ শস্য ও পঁচিশ টাকা নগদ এবং আঠার মণ শস্য ইত্যাদি। মোট ঋণের পরিমাণ সাকুল্যে নগদ ৩৮৮৲ এবং ১২২মন শস্য অথবা গড়ে পরিবার পিছু নগদ ১৯ টাকা এবং ৬ মন শস্য ; অপর একটি গ্রামে ৫৭টি পরিবারের মধ্যে ১৮টি কৃষক পরিবার মোট ৯৫৭ টাকা ঋণ গ্রহণ করে, তিনটি পরিবারে যাঁরা মেষপালক তাদের ঋণের পরিমাণ ৬৫ এবং অন্য ২টি পরিবারের ঋণের পরিমাণ নগদ ৩৫৲। তৃতীয় একটি গ্রামে জানা যায় সেখানে একুশটি কৃষক পরিবারে মধ্যে চৌদ্দটিই ঋণগ্রস্থ এবং তাদের মোট ঋণের পরিমাণ প্রায় ৯৯৯ টাকা।

হাজারিবাগ অঞ্চলের পূর্বদিকে কয়লাখনি অঞ্চল এবং রেল লাইন সম্প্রসারিত হওয়ায় কৃষির উদ্বৃত্ত পণ্যাদির বাজার খুঁজে পাওয়া সহজ হয়। জারবো সাহেবের (Mr. Jarbo'ৱ) বিবরণে প্রকাশ তিনি ঐ অঞ্চলের ২১টি পরিবারের (লোকসংখ্যা ১৫৭ জন) একটি গ্রামে সমীক্ষা করে দেখেছেন মাত্র একটি পরিবার কৃষির উপর নির্ভরশীল। বাকী অন্যান্যরা আংশিকভাবে শ্রমিক অথবা কারিগর হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করে। এই পরিবারগুলির অধিকাংশের খুবই সামান্য জমি অর্থাৎ মাত্র দুই থেকে তিন বিঘা জমি ছিল। এখানে বলা হয়েছে কৃষির আয় এবং শ্রমের বিনিময়ে যেটুকু আয় হয় তা এতই সামান্য যে দিনে দুমুঠো অন্ন যোগাড় করা তাদের পক্ষে ছিল খুবই দুঃসাধ্য। এদের ঘরবাড়ীগুলি খড় দিয়ে ছাওয়া এবং জঙ্গলা গাছ বা আগাছার বেড়া দিয়ে ঘেরা। রায়তরা ঋণ করে কাপড় চোপড় কিনত অথবা কখনও উপোষ করে থাকতো অথবা জঙ্গল থেকে আহরিত ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করত। কারিগর শ্রেণীর লোকেরা বরং মোটামুটি ভালো ছিল। তাদের মাটির ঘরে খাপড়ার চাল এবং তারা অনায়াসে পোষাক পরিচ্ছদ সংগ্রহ করতে সক্ষম ছিল।

CENTRAL LIBRARY

মহাজনের ঋণ প্রসঙ্গে পাটনার কমিশনার বক্সওয়েল সাহেব বলেছেন গরীব চাষীদের কৃষি কাজের জন্য ঋণ করা আর অমিতব্যয়ীদের ঋণ করার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল।১১ ঋণের বোঝা যার ঘাড়ে একবার চেপেছে তার পক্ষে ঋণমুক্ত হওয়া তো দুরের কথা বরং ঋণ গ্রহীতাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। মহাজনরা ঋণ দিয়ে বছরে উৎপাদন বহির্ভূত অন্য একটা আয়ের পথ প্রশস্ত রেখেছে। তিনি আরও বলেছেন শিক্ষার অভাবে সাধারণ মানুষ সঞ্চয়ের প্রয়োজন উপলব্ধি করেনি ফলে মহাজনরা তাদের হয়ে সঞ্চয় করে এবং অসময়ে ঋণ দিয়ে ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে সুদে আসলে ষোল আনা উশুল করে। সামাজিক বা ধর্মীয় কারণে যে ঋণ হয়ে থাকে তা অনেক ঋণগ্রহীতার জীবনে দুই তিনগুণও বৃদ্ধি পেয়েছে। সবচেয়ে দুরবস্থায় পতিত হয় যাদের পিতৃপুরুষের ঋণের বোঝা টানতে হয়। তাদের সারা জীবন ধরেই ঋণ ভারে জর্জরিত হতে হয়। এই পরিস্থিতিতে আবার যুক্ত হয় অজন্মার সময় নূতন ঋণ এবং সেই সুযোগে মহাজনরাও ঋণগ্রহীতাকে চড়া সুদে ঋণ নিতে বাধ্য করে। রায়তদের মধ্যে যারা কুড়ি পঁচিশ বিঘা বা তারও কম জমির মালিক তারাই সাধারণতঃ ঋণ করে। এরূপ ক্ষেত্রে তাদের বছরে ৫০ বা ৬০ মণ ধান ঋণ করতে হয়। ঋণ করার প্রবণতাকে বলা হয়েছে উৎপাদন-জনিত কারণ ছাড়া আংশিক কিছুটা স্বভাব আর কিছুটা মহাজনের সাথে একটা সম্পর্কে বজায় রাখা যাতে করে অসময়ে সাহায্য পাওয়া যায় বা কোনও মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে গেলে যেন অর্থ সাহায্য লাভের একটা সূত্র বজায় থাকে। যদিও মহাজনেরা ঋণগ্রহীতাকে নানারূপ অত্যাচার ও নিপীড়ন করে তবুও অনেক সময় জমিদার বা অন্যান্যদের অত্যাচার থেকে তাদের রক্ষা করে। এমন কি দুর্ভিক্ষের সময়ে দুর্গম অঞ্চ পাঁড়াগাঁয়ে মহাজনদের অনেকে নিম্নবিত্তদের ঋণ দিয়ে অনাহারের হাত থেকে রক্ষা করেছে বলেও জানা যায়। যাই হোক, ১৮৭২ সালে মহাজনদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে—**The Usury clause of Regulation III of 1872,** নামে একটি আইনের প্রবর্তন হয়।১২

সমগ্র দামোদর উপত্যকা অঞ্চলের নিম্নবিত্ত শ্রেণীর লোকেদের আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করতে গিয়ে দেখা যায় দামোদরের নিম্ন উপত্যকা অঞ্চলের অধিবাসীরা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে দামোদরের বন্যায় এবং বন্যার পরে মহামারীতে। ১৮৫০ সাল থেকে ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ পুর্বাঞ্চলে রেল লাইনের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে

CENTRAL LIBRARY

সঙ্গে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক জীবন ব্যাপকভাবে ক্ষতি-গ্রস্থ হয়।১৩ স্যার উইলিয়ম উইলকক্স কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা-মালার নিবন্ধে দামোদর ও ভাগীরথীর অতিরিক্ত জলে যে স্বাভাবিকভাবে কৃষি-ভূমিকে উর্বর করত তাকে তিনি ওভার ফ্লোইং ইরিগেশন (Overflowing Irrigation) বলে আখ্যায়িত করেছেন। সেই জলপ্রবাহ পরবর্ত্তীকালে দামোদরের বাঁধ রেল লাইনের উঁচু পথ এবং গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড প্রভৃতি দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হলে এইসব অবরোধগুলিকে শয়তানের শৃঙ্খল বলে বর্ণনা করেছেন।১৪ নিম্নাঞ্চলে দামোদরের জলে প্লাবিত অংশের জমির উর্বরতা পলিমাটি সঞ্চিত হওয়ার ফলে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সেই জল নিকাশনী পথ বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় ব্যাপক ম্যালেরিয়া ও মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়। ১৮৬২ সাল থেকে ১৮৭২ সাল পর্যন্ত ডাঃ ফ্রেনচের বিবরণ অনুযায়ী এই অঞ্চলের প্রায় এক তৃতীয়াংশ থেকে এই ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়ার কবলে পড়ে প্রাণ হারায়। অথচ স্যার হামিলটন যখন বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া পরিক্রমা (১৮১৫ খৃঃ) করেন তখন তিনি বলেছেন গোটা হিন্দুস্থানে দেখা গেছে কৃষির উৎপাদনে বর্ধমান হচ্ছে প্রথম এবং তানজোর হচ্ছে দ্বিতীয়। দামোদর নদের বেশ কিছু অংশ বার্নিয়ের সময়ে অর্থাৎ ১৬৬০ খৃঃ নৌচলাচলের উপযোগী ছিল। সেই সময় থেকে প্রায় দেড়শ বছর নদীনালাগুলি অবহেলিত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই নদীগুলি মজে যেতে শুরু করে। দামোদরের সেচ ব্যবস্থা তখন ভাগীরথীর পারের সেচ ব্যবস্থা থেকে অনেক উন্নত ছিল।

দামোদরের পাড়ে বাঁধ দিয়ে বন্যার জলকে রোধ করতে গিয়ে দেখা গেছে ১৮৪৭ সালে ২৫টি ১৮৪৯ সালে ১৪টি, ১৮৫০ সালে ৫৬টি, ১৮৫২ সালে ৪৫টি এবং ১৮৫৪ সালে ২৮টি স্থানে বাঁধ ভেঙ্গে বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়ার ব্যাপক অঞ্চলকে প্রবল বন্যায় প্লাবিত করেছে।১৫ কেউ কেউ অবশ্য মনে করেন সেচের প্রয়োজনে ইচ্ছাকৃতভাবে অল্প বাঁধ কেটে দেওয়া হয়। ১৮৫৫ সালে তদানীন্তন ইংরাজ সরকার দামোদরের বাঁধ সরকারী আওতায় নিয়ে নেয়।

ঐ সময়ে প্রায় একুশ লক্ষ একর পরিমাণ জমি বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়ায় চাষের উপযোগী ছিল। ঐ জমির প্রায় অর্ধেক দামোদর নদের বন্যার জলের উপর নির্ভরশীল ছিল। দামোদরে বাঁধ দিয়ে সেচের জলকে আটকে দেওয়ায় সমগ্র অঞ্চলে সেচের জলের অভাব পরিলক্ষিত হয়। ট্রাইনিয়াল রেভেন্যু রিপোর্টে বলা

CENTRAL LIBRARY

হয়েছে দামোদরের জলে সেচ দিলে কৃষির উৎপাদন প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। দামোদরের বাঁধ বেঁধে স্বাভাবিক সেচ ব্যবস্থা থেকে ঐ অঞ্চলের কৃষিকে তখন যেভাবে বঞ্চিত করা হয়েছিল তাতে হিসাব করে দেখা গেছে একমাত্র বর্ধমান অঞ্চলেই বার্ষিক ১০০ থেকে ১৩০ কোটী টাকার ক্ষতি হয়েছে।

অপরদিকে বন্যাপ্লাবন থেকে রক্ষা পেতে স্বাভাবিক কারণেই রেল লাইন, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ও বাড়ীঘর, রাস্তা উঁচু করার প্রয়োজন হোত ফলে নানাস্থানে খানা খন্দ, ডোবার সৃষ্টি হোত। বন্যার জল স্থানে স্থানে আটকে থাকায় ম্যালেরিয়ার বীজ বহনকারী এনোফেলিশ মশার স্বর্গরাজ্য গঠিত হয়। ম্যালেরিয়া ঐ অঞ্চলে প্রায় বার বছর তাণ্ডব চালায় ফলে সাড়ে সাত লক্ষ মানুষ এই রোগের বলি হয়।১৬ যারা বেঁচে রইল তারা প্লীহার রোগে আক্রান্ত হয়ে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে গ্রাম ছেড়ে শহরে পালিয়ে গেল। গ্রামগুলি ক্রমে ক্রমে শ্মশানে পরিণত হওয়ায়, জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে ওঠে এবং মানুষের বদলে বন্য প্রাণীর লীলাভূমিতে পরিণত হয়। এইভাবে দেখা যায় ১৮৭২ সাল থেকে ১৮৮১ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যার হিসাবে একভাবে বর্ধমান জেলার ১২টি থানায় দেড় লক্ষ লোক প্রাণ হারিয়েছে এবং হারিয়েছে অগনিত কৃষি শ্রমিক ও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে কৃষির উৎপাদন যার পরিণাম খাদ্য ঘাটতি ও দুর্ভিক্ষ। আর তার সঙ্গে দলে দলে কৃষি শ্রমিক গ্রাম ছেড়ে রিক্ত, রুগ্ন, শূন্যহাতে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে শহরে এসে ভূমিহীন শ্রমিকে পরিণত হয়েছে।

সূত্র নির্দেশ

১। Mr. Tayler's Memorandum to the Landholders Society, qnoted in the Report of the Commitee appointed to enquire into the abuses alleged to the Export of Coolies—1839.

২। Confidential letter—Agriculture No. 877-R dt. 30.6.1888 from P. Nolan, Secretary to the Govt. of Bengal to the Secretary to the Govt. of India, Revenue and Agricultural Dept.

৩। Famine Aspects of Bengal Distrtcts—W.W. Hunter, pp, 139.

৪। Commissioner of the Bardawn Division letter No. 7 RG dt. 16th April, 1888.

CENTRAL LIBRARY

৫। Famine Aspects of Bengal Districts,—W.W. Hunter pp. 126.
৬। Commissioner of the Burdwan Division letter No. 7 R 4 dt. 16th April, 1888.
৯। Famine Commissoner Report, 1866.
৮। Confidential Memo by—E. V. WESTMACOTT, offg. Commissioner, Burdwan Division, No. 13 RG dt. 6.6.1888.
৯। Letter No. 35IR dt. Ranchi, 31st. May, 1888, from C. C. Stevens C. S., Commissioner of the Chota Nagpur Division to the Secretery to the Govt. of Bengal, Revenue Deptt.
১০। Ibid.
১১। Letter no. 286 G dt. 2nd June, 1888 from Commissioner of the Patna Division.
১২। Letter no. 2 dt. Bhagalpur 9.4.1888, from John Beams, Commissioner, Bhagulpur and Santhal Parganahs to Secretary to Govt. of Bengal, Revenue Deptt. pp 2.
১৩। Agrarian Crisis in Damodar Bhagiraths Region By Sri Arabinda Biswas and Swapan Bardhan eographical Review of India, vt. 37, No. 2 June 75, pp 132 to 150.
১৪। Ancient system of Irrigation in Bengal—Sir William Wilcocees, 1930.
১৫। Hooghly Gagetteer.
১৬। C. A. Bentely, 1916—Report on Malaria in Bengal, pt. I, pp-67.
১৭। Report on the Condition of the Lower Classes of Population in Bengal.

CENTRAL LIBRARY

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মুসলিম সমাজে নবজাগরণের ধারা

অমলেন্দু দে

আধুনিক কালে মুসলিম সমাজে জাগরণের চিহ্নগুলো পরিস্ফুট হয় হিন্দু সমাজের অনেক পরে। কি কারণে মুসলিম সমাজ অনগ্রসর থাকে তার বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশ না করে কোন্ পটভূমিতে মুসলিম সমাজে আধুনিক জীবনের লক্ষণসমূহ বিকশিত হয় তার কথাই সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে দ্রুত ভারতের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে ক্রমান্বয়ে মুসলিম সমাজ পিছিয়ে পড়ে। ব্রিটিশ শাসনকে মুসলমানেরা সহজে মেনে নিতে পারেন নি। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ব্রিটিশ শাসন এদেশে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবার পরে তার বিরুদ্ধে মুসলিম সমাজে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তার প্রতিফলন পাওয়া যায় ওয়াহাবী ও ফরাজী আন্দোলনের (১৮১৮-১৮৭০) মধ্যে। সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭-১৮৫৮) পরেই মুসলিম সমাজের এক সচেতন অংশে নতুন চিন্তার সূত্রপাত হয়।(১) কোন্ পথে পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা আরম্ভ হয়। বাংলায় আবদুল লতিফ ও উত্তর প্রদেশে স্যার সৈয়দ আহমদ ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের উন্নতির কথা চিন্তা করেন। অন্যদিকে মৌলানা মুহম্মদ কাসিম ননৌতভীর পরিচালনায় উত্তরপ্রদেশের দেওবন্দে ইসলাম চর্চার যে কেন্দ্র স্থাপিত হয় সেখান-কার উদ্যোগী ব্যক্তিরা ধর্মীয় শিক্ষার সাহায্যে সমাজের মঙ্গল সাধনে ব্রতী হন। এই উভয় গ্রুপই ওয়াহাবী-ফরাজীদের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব পরিত্যাগ করে ব্রিটিশ শাসনের সহযোগিতায় তাঁদের নির্ধারিত পথে অগ্রসর হন। বলতে গেলে, মুসলিম সমাজের অনগ্রসরতা দূরীকরণের জন্য এই তিনটি কেন্দ্র প্রথম যুগে সক্রিয় ছিল : কলকাতা (১৮৬৩), আলিগড় (১৮৬৪) ও দেওবন্দ (১৮৬৭)। এই সময়ে আমরা যদি আবদুল লতিফের (১৮২৮-১৮৯৩), স্যার সৈয়দ আহমদের (১৮১৭-১৮৯৮) ও মৌলানা মুহম্মদ কাসিম ননৌতভীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করি তাহলে

ওয়াহাবী-ফরাজী-সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তীকালের এই দুটো ধারার ইতিহাস আমাদের কাছে স্বচ্ছ হয়ে উঠবে।(২) বাংলায় মুসলিম সমাজে জাগরণের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, প্রথম দিকে যে তিনজন ব্যক্তি সমাজের অগ্রগতির জন্য উদ্যোগী হন তাঁরা হলেন : নবাব আমির আলি (১৮১৭-১৮৭৯) আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমির আলি (১৮৪৯-১৯২৮)। নবাব আমির আলি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ন্যাশন্যাল ম্যাহোমেডান এসোসিয়েশন' গড়ে তোলেন। কিন্তু এর প্রভাব কতটা মুসলিম সমাজের ওপর পড়ে তা সুনির্দ্দিষ্ট করে বলার মত তথ্য আমাদের হাতে নেই।(৩) ১৮৫২-১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আবদুল লতিফ মুসলমান যুবকদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনে আত্মনিয়োগ করেন। অর্থাৎ হিন্দু কলেজ (১৮১৭) স্থাপনের পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যেই বাঙালী মুসলিম সমাজে ইংরেজির মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষালাভের আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়।(৪) ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে আবদুল লতিফ এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। অবশ্য ইতি-পূর্বেই কলিকাতা ও হুগলি মাদ্রাসাতে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে আবদুল লতিফ 'ম্যাহোমেডান পিটারেরী সোসাইটি অব ক্যালকাটা' প্রতিষ্ঠা করে মুসলমানদের সঙ্ঘবদ্ধ করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ আমির আলিও 'সেণ্ট্রাল ন্যাশন্যাল ম্যাহোমেডান এসোসিয়েশন অব ক্যালকাটা' গঠন করে মুসলমানদের অবস্থা উন্নয়নে অগ্রসর হন।(৫) আর একজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি যিনি ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি. এ. পাশ করেন এবং প্রথম বাঙালী মুসলিম গ্রাজুয়েট ছিলেন, যাঁর নাম হল দিলওয়ার হোসেন আহমদ (১৮৪০-১৯১৩), তিনিও অনেক ইংরেজি প্রবন্ধের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে সংস্কার সাধন করে তার উন্নতির চেষ্টা করেন। তিনি ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ আমির আলি প্রতিষ্ঠিত সংস্থার সহ-সভাপতিও হন।(৬) এঁরা সবাই ছিলেন সম্ভ্রান্ত ও বিত্তশালী পরিবারের। আবদুল লতিফের নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গে, আর সবাই ছিলেন পশ্চিম-বঙ্গের বাসিন্দা। অবশ্য তাঁদের সব উদ্যোগ প্রচেষ্টা কলকাতাকে কেন্দ্র করেই ছিল।(৭) পরবর্তীকালে ঢাকা শহরেও শিক্ষিত মুসলমানেরা 'ঢাকা ম্যাহোমেডান ফ্রেণ্ডস এসোসিয়েশন' (১৮৮৩) নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। এইসব প্রতিষ্ঠান মুসলিম জনমত তৈরী করে সমাজকে পরিবর্তিত করতে চেষ্টা করে। আবদুল লতিফ যখন ইংরেজ শাসনের সহযোগিতায় আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের

CENTRAL LIBRARY

যারা মুসলিম সমাজের উন্নতির চেষ্টা করেন তখন তাঁর কাজে সহায়ক হন বিখ্যাত ধর্মীয় নেতা মৌলানা কেরামত আলি (১৮০০-১৮৭৩)। তিনি ছিলেন জৌনপুরের অধিবাসী। কেরামত আলি মুসলমান ছাত্রদের ইউরোপীয় ভাষা আয়ত্ত করে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের উপদেশ দেন।(৭) এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙালী মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয়।

এই সময়ে মুসলিম সমাজে জাগরণের আর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হল বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা। সুলতানী আমলে এই ভাষায় সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত হলেও, উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করে মুসলমান লেখকেরা এই ভাষাকে সমৃদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম মননশীলতাকে আধুনিক জীবনের উপযোগী করতে সহায়তা করেন। বাংলা ভাষাতে কয়েকখানি ধর্ম গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। বাঙালী মুসলমানেরা ইসলাম ধর্মের আচরণবিধি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। এই অজ্ঞতা দূর করবার জন্য ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 'জোব্দাতল মসায়েল' নামক গ্রন্থ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়।(৯) প্রায় একই সময়ে মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১১) রচিত উপন্যাস 'রত্নবতী' (১৮৬৯) এবং দুটো নাটক 'বসন্তকুমারী' (১৮৭৩) ও 'জমিদার দর্পণ' (১৮৭৩) প্রকাশিত হয়। তিনি বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মীর মশাররফ হোসেনের পরিচালনায় 'আজীবন নেহার' নামক একটি পাক্ষিক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়।(১০) তখন থেকেই বাংলা ভাষায় ধর্ম ও সাহিত্য দিয়ে চর্চার সূত্রপাত—অর্থাৎ একদিকে ধর্মীয় গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে ইসলামের বিশুদ্ধতা বজায় রাখার প্রয়াস, আর তারই পাশাপাশি সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে মুসলিম মননকে সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টা। এইসব প্রয়াস মুসলিম সমাজের সামনে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে, আর তার ফলে মুসলিম বুদ্ধিজীবীর আত্মজিজ্ঞাসাও শুরু হয়। প্রসঙ্গত মীর মশাররফ হোসেনের ওপর 'গ্রামবার্তা'র সম্পাদক হরিনাথ মজুমদারের ও 'সংবাদ প্রভাকরে'র সহকারী সম্পাদক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রভাবও লক্ষ্যণীয়।(১১) ১৮৮১-১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন একখানি অমূল্য গ্রন্থ সমগ্র বাঙালী সমাজকে, বিশেষ করে বাংলা ভাষী মুসলমানদের উপহার দেন। এই সময়ে তিনি সর্বপ্রথম মূল আরবি থেকে বাংলায় কোরাণের সম্পূর্ণ অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে অপরিসীম পরিশ্রম করে তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষিত বাঙালী

CENTRAL LIBRARY

মুসলিম সমাজে সাদরে তাঁর অনূদিত কোরাণ গ্রন্থ গৃহীত হয়।১২ ১৮৮৫-১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে মীর মশাররফ হোসেন লিখিত 'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থখানাও বাঙালী পাঠক সমাজে আলোড়নের সৃষ্টি করে। তিনি 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (উপন্যাস, ১৮৯০) ও 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' (রস রচনা, ১৮৯৯) গ্রন্থসমূহে সমাজের মুখোশ উন্মোচিত করেন।(১৩)

উনবিংশ শতাব্দীর আর একজন বিশিষ্ট মুসলমান লেখক হলেন পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন আহমদ মাশহাদী (১৮৫৯-১৯৩৯)। তিনি কলিকাতা মাদ্রাসার 'আলীয়া'র সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার অধ্যাপক ছিলেন।(১৪) সংস্কৃত ভারাক্রান্ত বাংলা ভাষায় রচিত তাঁর রচনা 'সমাজ ও সংস্কারক' ধারাবাহিকভাবে সাপ্তাহিক 'সঞ্জীবনী'তে প্রকাশিত হয়। এই রচনা ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থে মুসলিম জগতের রাজনৈতিক পটভূমিতে প্যান ইসলাম মতবাদের প্রচারক সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানীর জীবনী ও কীর্তি আলোচনা করা হয়েছে।(১৫) পণ্ডিত মাশহাদী ছিলেন ব্রিটিশ শাসন বিরোধী। এই গ্রন্থখানি সরকার বাজেয়াপ্ত করে। তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অন্তরঙ্গতা ছিল। পণ্ডিত মাশহাদী আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন : 'অগ্নিকুক্কুট' (১৮৯০), 'প্রবন্ধ-কৌমুদী' (১৮৯১), 'সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা' (১৮৯২), 'স্মরিয়া-বিজয়' (বাংলাসন ১৩০২) ইত্যাদি।(১৬) পণ্ডিত মাশহাদী বাংলা ভাষার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করেন। তাঁর রচনাবলী "সাহিত্য ভাণ্ডারে অতুলনীয় সামগ্রী" হিসেবে কোন কোন সমালোচক উল্লেখ করেন।(১৭) পণ্ডিত মাশহাদী আজীবন জামালউদ্দীন আফগানীর চিন্তাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হন। পণ্ডিত মাশহাদী বিজ্ঞান পরিশীলনের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় জীবনের ক্ষেত্রে স্বধর্মনিষ্ঠ থেকেও সাম্প্রদায়িক মিলনের কথা বলেন, আর জাতীয় সংহতিকে 'জনহিত' ও 'দেশমুক্তির' উপায় মনে করেন।(১৮) স্বভাবতই এইসব লেখকদের রচনার ফলে মুসলিম মানসে নানা প্রশ্নের ভীড় জমে। মুসলিম মননকে প্যান ইসলামীয়, জাতীয়তাবাদী, ধর্মীয় উদারনৈতিক, মানবিক, যুক্তিবাদী ইত্যাদি নানা চিন্তা প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করে। আর তাতে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত মুসলিম পত্র-পত্রিকারও মস্তবড় ভূমিকা ছিল। প্রসঙ্গত 'আখবরে এসলামিয়া', 'আহমদী', 'হিন্দু-মুসলিম সম্মিলনী', 'কোহিনুর', 'প্রচারক', 'হিতকরী' মিহির, ও সুধাকর', 'ইসলাম প্রচারক', 'হাফেজ' ইত্যাদি পত্র-পত্রিকার কথা

CENTRAL LIBRARY

উল্লেখ করা যেতে পারে ।(১৯) উনবিংশ শতাব্দীর এই নবজাগরণে বাংলা ভাষার যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই ।

সুতরাং উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে আমরা বাংলায় মুসলিম জাগরণের উপাদানগুলোকে কয়েকটি ভাগে চিহ্নিত করতে পারি : (ক) ফরাজী-ওয়াহাবী আন্দোলনে এবং সিপাহী বিদ্রোহে মুসলমানদের ভূমিকায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ধারা ; (খ) শিক্ষিত-সম্ভ্রান্ত মুসলমান নেতাদের প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব পরিত্যাগ করে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করার প্রয়াস ; (গ) খ্রীষ্টান, হিন্দু ও ব্রাহ্ম ধর্মের প্রভাব মুক্ত হয়ে ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য মুসলিম ধর্মীয় নেতাদের প্রচেষ্টা ; (ঘ) বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে মুসলিম মননকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে কয়েকজন মুসলিম লেখকের অবদান। সামগ্রিকভাবে এই সব আন্দোলনের ও প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে বাঙালী মুসলিম সমাজে জাগরণ ঘটে। এই উপাদানগুলোকে আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী যেমন মনে হবে, তেমনি প্রতিটি স্বতন্ত্র উপাদানের মধ্যেও অনেক বিরোধী উপাদানের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ফরাজী-ওয়াহাবী আন্দোলন গ্রাম বাংলার মুসলমানদের এক নতুন চিন্তায় উদ্দীপ্ত করে। আর ফরাজী-ওয়াহাবী তত্ত্বেই জমির ওপর কৃষকের মালিকানা স্বত্বের প্রশ্নটি মূর্ত হয়ে ওঠে। যাঁরা ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে সহযোগিতায় আধুনিক শিক্ষার প্রবর্ত্তক ছিলেন, তাঁরা ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য-বোধকে আশ্রয় করেই তার ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। সম্পূর্ণভাবে ইসলাম ধর্ম নির্ভর থেকে ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে বৈষয়িক উন্নতি সাধন করা ছিল তাঁদের প্রবর্ত্তিত শিক্ষা সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য। অন্যদিকে ধর্মীয় নেতারা ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষা করে সম্ভ্রান্ত, উচ্চবিত্ত এবং নিরক্ষর দরিদ্র মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধে উজ্জীবিত করেন। পশ্চিমের উদারনৈতিক-গণতান্ত্রিক-মানবিক চিন্তাদর্শ যাতে করে ইসলামীয় সামাজিক কাঠামোর কোন ক্ষতিসাধন করতে না পারে সে বিষয়ে নেতৃবৃন্দ খুবই সচেতন ছিলেন। অনগ্রসর মুসলিম সমাজকে জাগ্রত করতে এই উভয় প্রচেষ্টাই যথেষ্ট সহায়ক হয়। মুসলিম সমাজে অনেক অ-ইসলামীয় বিধি-আচরণ প্রচলিত ছিল। সেগুলোকে পরিহার করে এই ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিরাই মুসলিম সমাজকে সংহতি প্রদান করেন। এই কাজটি প্রথমে শুরু করেন ওয়াহাবী ও ফরাজী ধর্ম সংস্কারকেরা। মুসলিম সমাজে জাগরণের ক্ষেত্রে

CENTRAL LIBRARY

এই সংহতি বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে ইসলামের প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে একাত্মবোধ জাগ্রত হওয়ায় বাঙালী মুসলমান তাঁর নিজস্ব পৃথক সত্তা সম্পর্কে সচেতন হন। সাহিত্য চর্চাও শিক্ষিত মুসলমানদের চিন্তাকে যথেষ্ট সঞ্জীব করে তোলে। বাঙালী মুসলমানদের মত একটি অনগ্রসর সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এখানে যেভ'বে জাগরণ ঘটেছে তাকে সমসাময়িক ঘটনার বিশ্লেষণে অস্বাভাবিক বলা যায় না। কিন্তু ক্রমান্বয়ে এই জাগরণকে একটি সুসঙ্গত ও সুস্থিত পথে পরিচালনা করতে না পারায় এই উপাদানগুলোর মধ্যে যে পরস্পর বিরোধী অনেক উপাদান ছিল তা ক্রমান্বয়ে প্রবল হয়ে ওঠে; তার ফলে যুক্তিশীল-মানবিক উপাদানগুলোর স্বাভাবিক অগ্রগতির পথে নানা অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়। বাঙালী মুসলিম সমাজে ধর্মনেতাদের ধর্মীয় চিন্তার সঙ্গে মানবিক যুক্তিশীল চিন্তার অধিকারী ব্যক্তিদের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রটি নিয়ে অনুসন্ধান করলে বিষয়টি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে।(২০) উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী মুসলিম সমাজে আত্ম-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রখ্যাত লেখক মীর মশাররফ হোসেন। তাঁর রচনায় মধ্যযুগীয়তা ও আধুনিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ও ধার্মিকতা ইত্যাদি বিপরীতধর্মী উপাদানের সংমিশ্রণ থাকা সত্ত্বেও, তিনি মুসলিম সমাজের এই নতুন জাগ্রত চেতনাবোধকে প্রতিবেশী অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে সহজ সম্পর্ক গড়ে তুলে এক মহত্তর পটভূমিতে উন্নীত করতে প্রয়াসী হন। কিন্তু ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষার নামে ধর্মীয় নেতারা যেভাবে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধকে উজ্জীবিত করেন তার ফলে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সহজভাবে চলবার পথটি ক্রমান্বয়ে সংকীর্ণ হতে থাকে। এই কারণেই মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজিজ্ঞাসা এক সীমিত গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে। গোঁড়া মুসলমানদের নিন্দায় তাঁর কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে যায়।(২১) প্রসঙ্গত তাঁর 'গোজীবন' (বাংলা ১২৯৫) পুস্তিকা যে বিতর্কের সৃষ্টি করে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে তিনি 'গো-কোরবাণী' সম্পর্কে যেসব মতামত ব্যক্ত করেন তার বিরুদ্ধে পণ্ডিত মাশহাদী 'অগ্নিকুক্কুট' পুস্তিকায় অনেক যুক্তি প্রমাণ হাজির করেন।(২২) এই বিতর্কে পণ্ডিত মাশহাদী "উগ্র স্বধর্মপ্রীতি ও স্বদেশপ্রীতি" ব্যক্ত করেন, আর মশাররফ হোসেনের কণ্ঠে "উদার মানবিকতা ও শ্রেয়োবোধ" উচ্চারিত হয়। পণ্ডিত মাশহাদীর রচনায় 'স্বাধীন', 'অখণ্ড ভারতবর্ষের' রাজ-নৈতিক চিত্র পাওয়া গেলেও 'উগ্র স্বধর্মপ্রীতি' তাঁর চিন্তার স্বচ্ছতাকে অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষুণ্ণ করে।(২৩) একই কারণে দিলওয়ার হোসেনও মুসলিম সমাজকে

আধুনিক জীবনের উপযোগী করবার জন্য সমাজ সংস্কারের পক্ষে কলম চালনা করে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি।২৪ মীর মশাররফ হোসেন, পণ্ডিত মাশহাদী ও দিলওয়ার হোসেন প্রণীত রচনাবলী ও সমসাময়িক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধকে আশ্রয় করে মুসলিম জাগরণ ঘটায় মুসলিম মননশীলতা এক ব্যাপক পরিধি দিয়ে পরিব্যাপ্ত হতে পারেনি। নেতৃবৃন্দের ও লেখকদের অবদানে আত্মজিজ্ঞাসা জাগ্রত হলেও তা শিক্ষিত মুসলমানের মনকে ধর্মীয় গণ্ডীর বাইরে বিশেষ প্রসারিত করতে পারেনি। এমন কি ফরাজী-ওয়াহাবী আন্দোলনে যেসব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয় সে বিষয়েও কোন যথার্থ মূল্যায়ন মুসলিম বুদ্ধিজীবীর রচনায় পাওয়া যায় না। বিভিন্ন ধর্মকে পরস্পরের নিকটতর করে যে নতুন মানব সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা কোন কোন সাধকের মধ্যে দেখা যায় তাকেও প্রজ্জ্বলিত করার কোন প্রয়াস মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের ও ধর্মতত্ত্ববিদদের রচনায় লক্ষ্য করা যায় না।(২৫) এইসব কারণে মুসলিম সমাজের নবজাগরণের প্রবাহ এক প্রবল তরঙ্গমালার সৃষ্টি করে সমগ্র বাঙালী জীবনকে সঞ্জীবিত করতে সক্ষম হয়নি।

সূত্র নির্দেশ ও আলোচনা

১। বিস্তৃত আলোচনার জন্য আমার গ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য :

(ক) বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ (কলিকাতা, মে, ১৯৭৪) ;

(খ) **Roots of separatism in Nineteenth Century Bengal (Caloutta, November, 1974)**

২। ঐ

৩। ঐ

৪। ঐ

৫। ঐ

৬। **Delawar. Hossen Ahmed, Essays on Mahammedan Social Reforms, vols. I-II, Caloutta. 1889.** আমার ছাত্রী শ্রীমতী সুলতান জাহান আহমদ এই দুই খণ্ড মূল্যবান গ্রন্থ সম্পাদনা করে প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন। গবেষকেরা তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে অনেক মূল্যবান তথ্য পাবেন।

CENTRAL LIBRARY

৭। আবদুল লতিফের নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলায়। তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি কলকাতায় তালতলা লেনে থাকতেন। জাষ্টিস সৈয়দ আমির আলি হুগলি জেলার লোক ছিলেন এবং কলকাতায় থাকতেন। দিলওয়ার হোসেন আহমদের নিবাস ছিল হুগলি জেলার বাবনান গ্রামে। তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটর ছিলেন। তিনিও কলকাতায় থাকতেন।

৮। আমার গ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য।

৯। ঐ

১০। মীর মশাররফ হোসেন রচিত গ্রন্থাবলী ও আমার গ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য।

১১। মুনীর চৌধুরী, মীর-মানস, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃঃ ৩।

১২। ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন, কোর্-আন্ শরীফ, মূল কোর্-আন্ শরীফ হইতে অনুবাদিত। চতুর্থ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৩৬, পৃষ্ঠা : ৭২০

কেশবচন্দ্র সেন বিভিন্ন ধর্মকে পরস্পরের নিকটতর করে এক নতুন মানব পরিবার রচনায় উদ্যোগী হন। সকল ধর্মের অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ উপভোগ করে তিনি নিজে তৃপ্তিলাভ করেন, আর তাঁর সহযোগীদেরও উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্ম সমন্বয়ের আলোক অধ্যয়নের জন্য চারজন সাধককে নির্বাচিত করেন। ইসলাম ধর্ম অধ্যয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ভাই গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৫-১৯১০)। সাত বছর বয়স থেকেই গিরিশচন্দ্র ফার্সী ভাষা শেখেন। তিনি ময়মনসিংহ শহরে মৌলবীর নিকটে উচ্চ ফার্সী সাহিত্য শিক্ষালাভ করেন। তিনি উর্দু ভাষাও শেখেন। একই সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায়ও তিনি দক্ষতা অর্জন করেন। স্বভাবতই তিনি ছিলেন কেশবচন্দ্রের চিন্তাকে বাস্তবে রূপদানের উপযোগী ব্যক্তি। কোরান শরীফ পাঠ করে ইসলাম ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব অবগত হবার জন্য গিরিশচন্দ্র ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ শহরে গিয়ে আরবি ভাষা চর্চা করেন। এই সময়ে লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত মৌলবীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের শেষে তিনি ময়মনসিংহে এসে কোরাণ অনুবাদ করতে আরম্ভ করেন। ছয় বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি কোরাণ অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন। গিরিশচন্দ্র কোরাণ অনুবাদ করতে কোন মৌলবীর সাহায্য নেননি। তিনি নিজেই শুদ্ধ তফসিরাদি গ্রন্থের সাহায্যে অনুবাদ করেন। তাঁর অনুবাদিত কোরাণ প্রথমে খণ্ডাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ড ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে শেরপুরে 'চারুযন্ত্রে' মুদ্রিত হয়। দ্বিতীয়

CENTRAL LIBRARY

খণ্ড ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড কলিকাতার 'বিধানযন্ত্রে' মুদ্রিত হয়। সম্পূর্ণ অনুবাদ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে (১৮৮৬) একহাজার কপি ছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ, এক হাজার কপি, ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় 'দেবযন্ত্রে' মুদ্রিত হয়। তৃতীয় সংস্করণ, এক হাজার কপি, ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় 'মঙ্গলগঞ্জ মিলন প্রেসে' মুদ্রিত হয়।

এই অনুবাদের দুই খণ্ড ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম সমাজের কয়েকজন জ্ঞানী ব্যক্তি গিরিশচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে লিখিত এই ধরনের একখানি প্রশংসাপত্র এখানে উদ্ধৃত করছি :

To the author of the Bengali Translation of the Koran, Calcutta

Revd. Sir,

We the undersigned have most carefully and attentively read and campared with the original the first two parts of your valuable production, viz., the Bengali translation of the Koran, and our curiosity is not less excited to find it to be such a faithful and literal translation from a classic language as the Arabic—which varies so widely in its construction from all other languages of the world.

As we are Mahomedans by faith and birth, our best and hearty thanks are due to the author fot his disinterested and patriotic effort and ths great troubles he has taken to diffuse the deep meaning of our Holy and Sacred religions book, the Koran, to the public.

The version of the Koran above quoted has been such a wonderful success that we would wish the author would publish his name to the public, to whom he has done sueh a valuable service, and thus gain a personal regar l from the public.

Lastly in our humble and poor opinion we think that the book may be very useful, particularly to the Mahamedans, if the style could be renderd a little casier so as to be understood by the less erudite.

We have hononr to be,

Revd. Sir,

CENTRAL LIBRARY

Your most obedient servants,
Ahmud Ullam
Late Arabic Senior Scholar
of the Calcutta Madrassah,
Abdul Ala
Abdul Aziz

Calcutta,
The 2nd March,
1882

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র অনুবাদিত কোরাণের যে চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাতে মোহাম্মাদ আকরম খাঁ যে 'শ্রদ্ধা-নিবেদন' করে মুখবন্ধ লেখেন তাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দীর্ঘ মুখবন্ধের শেষ অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত করছি : "ভাই গিরীশ চন্দ্র ভক্ত, সাধক ও অসাধারণ তেজোদৃপ্ত কর্ম্মযোগী। তাঁহার গুণ গরিমার পরিচয় দিতে যাওয়ার ধৃষ্টতা আমার নাই, তাঁহার কর্ম্মজীবনের সমালোচনা করার অবকাশও এক্ষেত্রে নাই। শুনিয়াছি কোর-আনের ও অন্যান্য এছলামী ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশের গুরু দায়িত্ব গিরীশচন্দ্রের উপর ন্যাস্ত করার সময় কেশবচন্দ্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন—'তোমার জীবন মহাপুরুষ মোহাম্মদের স্পিরিটে মহিমান্বিত ও অনুপ্রাণিত হউক।' তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সব সাধনা ও সিদ্ধির মধ্যে এই প্রার্থনাটি সার্থক হইয়া আছে, এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে আজ এইটুকু বলিলেই বোধহয় যথেষ্ট হইবে। বাংলার তিন কোটি মুছলমান জনসাধারণকে তাহাদের আল্লার, রছুলের ও কোর্-আনের সহিত পরিচিত করিয়াছেন সর্বপ্রথমে তিনিই। তাঁহারই অক্লান্ত সাধনার সম্যক ফলেই বাংলার পাঁচ কোটি অধিবাসী কোর-আন শরীফের, এছলাম ধর্ম্মের ও হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার স্বরূপ সর্বপ্রথমে জানিতে পারিয়াছে। তাই গুরু হিসাবে, অগ্রপথিক হিসাবে এবং সত্যের অবিচল সেবক হিসাবে, তাঁহার প্রতি অন্তরের গভীরতম শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াই আজ ক্ষান্ত হইতেছি।

"আমার বেশ স্মরণ আছে, শৈশবে পিতার সঙ্গে দুইবার গিরীশচন্দ্রের বাস-ভবনে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম। উভয়ের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া ধর্ম্মালাপ হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিন গিরীশচন্দ্র বাবাকে বলিয়াছিলেন—'আজও দেখছি, খোকাকে সঙ্গে করে এনেছেন।' বাবা হাসিয়া বলিয়াছিলেন—'ছেলে মানুষ করা বড় দায় ভাই ছাহেব। তাই কেতাব পড়ানর চাইতে বেশী দরকার মনে করি সৎসঙ্গের।' গিরীশচন্দ্রের সেদিনকার সেই 'খোকা' গুণমুগ্ধভক্ত

CENTRAL LIBRARY

হিসাবে, তিনকোটি বাঙ্গালী মুছলমানের পক্ষ হইতে তাঁহাকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছে।" (১নভেম্বর, ১৯০৬)

উনবিংশ শতাব্দীতে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন রচিত ইসলাম ধর্ম বিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থাবলী এখানে উল্লেখ করা হল :

(১) প্রবচনাবলী (আরবি হতে অনূদিত), ১৮৮৫ ; (২) হদিস্ বা মেসকাত্ মসবিহ [টীকাসহ বাংলা অনুবাদ], ১৮৯২-১৮৯৮ ; (৩) মহাপুরুষ-চরিত ১ম [এব্রাহিম, মুসা, দাউদের জীবনচরিত], ১৮৮২-১৮৮৬ ; (৪) মহাপুরুষ চরিত হয় [মোহাম্মদের জীবনচরিত], ১৮৮৫-১৮৮৭ ;

(৫) তাপসমালা [৯৬ জন মুসলমান তপস্বীদের জীবন বৃত্তান্ত], ১৮৮০-১৮৯৬ ; (৬) দরবেশী [কিমিয়ায় সাদত প্রভৃতি মূল মোহাম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্র হতে সঙ্কলিত], ১৮৭৮-১৯০১ ; (৭) ধর্ম্ম-বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্য [কিমিয়ায় সাদত ও তেজ করতোল আউলিয়া নামক মূল পারস্য গ্রন্থ হতে সঙ্কলিত], ১৮৭৫ ; (৮) তত্ত্ব-কুসুম [গোলসানে আগ্রার নামক মূল পারস্য গ্রন্থ হতে সঙ্কলিত], ১৮৮১ ।

বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত গিরিশচন্দ্রের গ্রন্থসমূহ এখানে উল্লেখ করিনি। তাঁর মৃত্যুর পরে আর কেউ ইসলাম ধর্মের চর্চা এবং অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে তার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেননি। তিনি যে সমস্ত অমূল্য আরবি, ফার্সী ও উর্দু পুঁথি ও গ্রন্থ সংগ্রহ করেন তাও অযত্নে নষ্ট হয়ে যায়। তাঁর 'হাফেজের' পাণ্ডুলিপিও হারিয়ে যায়। 'হদিস' গ্রন্থের যে অংশ তিনি অসমাপ্ত রেখে যান তা কেউ আর সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেননি [দ্র সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, কলিকাতা, পৃষ্ঠা : ১-৩২]

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন রচিত এইসব অমূল্য গ্রন্থাবলী উনবিংশ শতাব্দীতে ও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে মুসলিম মননের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের এই প্রচেষ্টা হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মিক সেতুবন্ধনের এক উজ্জ্বল প্রয়াস বলা চলে। কেশবচন্দ্র ও তার ভাবশিষ্যরাই ছিলেন এই ধারার প্রবর্ত্তক। এই ধারাটি কেন তার সহজ গতি হারিয়ে ফেলল তার বিশ্লেষন করেও রচনায় পাওয়া যায় না। মুসলিম নবজাগরণের বিষয় আলোচনায় গবেষকেরা গিরিশচন্দ্রের রচনাবলীর প্রভাবের কথা আদৌ মনে রাখেন না। এমন কি ইসলাম তত্ত্ব আলোচনায় নিযুক্ত ব্যক্তিরাও তাঁর উল্লেখ করেন না। অথচ বাংলা ভাষায় তাঁর মত আর কেউ তো ইসলাম ধর্ম বিষয়ক এত

CENTRAL LIBRARY

মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেননি। তাই গিরিশ চন্দ্র কঠোর সাধনা করে যে ইসলাম তত্ত্বের এক নতুন ভিত্তি স্থাপন করেন তা নিয়ে গভীর অনুশীলন করলে আমরা সেকালের ঔদার্যবোধের সঙ্গে পরিচিত হতে পারি। বাংলার মুসলিম সমাজে নবজাগরণে এই ঔদার্যবোধের ধারাটি অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার দায়িত্ব বর্তমান কালের গবেষকদের।

১৩। মীর মশাররফ হোসেন রচিত গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য।

১৪। আবদুল কাদির (সম্পাদিত), মাশহাদী-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, ডিসেম্বর, ১৯৭০, পৃষ্ঠা : ৩০৮।

১৫। ঐ, পৃ: ১-৮৯

১৬। ঐ, পৃ: ৯১-৩০২

১৭। ঐ, পৃ: ৭

১৮। ঐ, পৃ: ৩৩২

১৯। আমার গ্রন্থ বাঙালী বুদ্ধিজীবী দ্রষ্টব্য এবং আমার প্রবন্ধ **Role of Bengali Muslim Press in the Growth of Muslim Public opinion in Bengal (1884-1914)**

২০। আমার গ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য।

২১। ঐ

২২। মীর মশাররফ হোসেন, গোজীবন, ২৫ ফাল্গুন, ১২৯৫ (বাংলা সন)। এই পুস্তিকায় মীর মশাররফ খুব নরম ভাষায় হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রয়োজনে গো-বধ বন্ধ করতে বলায় গোঁড়া মুসলমানেরা তাঁকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন। মীর মশাররফ হোসেন লেখেন : "গো-মাংস না খাইলে মুসলমানি থাকিবে না, মহাপাপী হইয়া নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে—একথা কোথাও লেখা নাই।...

"এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিই প্রধান। পরস্পর এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, ধর্মে ভিন্ন, কিন্তু মর্মে ও কর্মে এক—সংসার কার্যে ভাই না বলিয়া আর থাকিতে পারি না। আপদে বিপদে সুখে-দুঃখে সম্পদে-দুর্ভাগ্যে পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন উদ্ধার নাই। সুখ নাই, শেষ নাই, রক্ষার উপায় নাই। এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যাহাদের সঙ্গে, এমনচিরসঙ্গী যাহারা, তাহাদের মনে ব্যথা দিয়া লাভ কি ?...

CENTRAL LIBRARY

"গো-কোরবাণী না হইয়া ছাগলও কোরবাণী হইতে পারে। তাহাতেও ধর্মরক্ষা হয়।..."

পণ্ডিত মাশহাদী এইসব কথার উত্তর দেন তাঁর 'অগ্নিকুক্কুট' পুস্তিকায় তিনি অনেক তথ্যের উল্লেখ করে গো-বধের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। [দ্র আবদুল কাদির (সম্পাদিত), মাশহাদী-রচনাবলী, পৃঃ ২৩৫-৩০২, ৩১৭-৩১৮]

২৩। আবদুল কাদির (সম্পাদিত), মাশহাদী-রচনাবলী, পৃঃ ৩১৮

২৪। Delawar Hossen Ahmed, op cit.

২৫। আমার গ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য।

CENTRAL LIBRARY

বিনয় কৃষ্ণ দেব ও সেকালের ক'লকাতা*

ভাস্কর চক্র

বিনয়কৃষ্ণ দেব ১৯০৫ সালে কলকাতার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে কলকাতা বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী লণ্ডন ছাড়া অন্য কোন শহরের চেয়ে আয়তন, সৌন্দর্য ইত্যাদিতে বড় ছিল না। কলকাতার জন্মকথা বোধহয় রাশিয়ার রাজধানী সেণ্ট পিটার্স বুর্গের চেয়ে অভিনব। ১৬৯০ সালে জন্মলাভ করে এই শহর ১৭০৭ সালে প্রেসিডেন্সি টাউনের মর্যাদা লাভ করে। অন্যত্র (পৃঃ ১৩৬) বিনয়কৃষ্ণ বলেছেন ১৬৯৮ বা ৯৯ এ কলকাতা প্রেসিডেন্সি টাউন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এ পরস্পর বিরোধী তথ্য পাঠকের নজরে আনার কৃতিত্ব অবশ্যই সম্পাদকের। ১৭৯৩ সালে রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুযায়ী কলকাতার প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। শুধু মাত্র রজৈনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে নয়, বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবেও কলকাতা ভারতের অন্য প্রসিডেন্সি টাউনের চেয়ে এগিয়ে ছিল। বহু পর্যটক একে প্রাসাদ নগরী বলে আখ্যা দিয়েছেন। শুরু থেকেই কলকাতা শুধুমাত্র বাঙ্গালীর নয়, বরং বহু জাতির মিলন স্থল হিসেবে গড়ে উঠেছে।

কলকাতা ভারতবর্ষের ইতিহাসের, শুধু ভারত কেন, পৃথিবীর ইতিহাসে বহু যুগান্তকারী ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছে। জোব চার্ণক যখন তাঁর বিখ্যাত বট গাছের (যদিও এ বটগাছ কোথায় ছিল এ সম্বন্ধে তর্কের অবকাশ আছে) তলায় বসে তাঁর প্রিয় হুক্কায় টান দিচ্ছিলেন তখন তাঁর মনে আজকের কলকাতার কোন ছবি ভেসে ওঠে নি। সতের শতকের শেষ দিকের বেনিয়া মনোবৃত্তির প্রতিভূ হিসেবে তিনি হিন্দুস্থানে ধুলো মুঠো করে সোনা করতে চেয়েছিলেন। তবুও তাঁর সেই আশ্রয় স্থলেই আজকের কলকাতা মহানগরীর সূত্রপাত।

---

*Raja Binaya Krishna Deb *The Early History and Growth of Calcutta*
Reprint, Rddhi, 1977
Calcutta
Editor Subir Ray Chaudhuri

CENTRAL LIBRARY

কলকাতার আদি পর্বের কথা বিশেষ জানতে পারা যায় না। অন্তত: নথিপত্রে তো নয়ই। হলওয়েল দুঃখ করেছেন যে ১৭৩৭ সালের আগের নথিপত্র ১৭৩৮ সালের ঝড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। অবশ্য এর পেছনে উই ইঁদুর আর অগোছাল আমলাদের অবদানও কম নয়। তাই কলকাতার প্রাচীন ইতিহাস খুঁজতে গবেষককে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর দলিল পত্র খুঁজতে হয়।

হলওয়েলের আঁকা কলকাতার ছবি বাস্তবিকই খুব একটা উৎসাহব্যঞ্জক নয়। অস্বাস্থ্যকর, নোংরা জঙ্গলাকীর্ণ এবং বন্য পশু ও চোর ডাকাতের লীলাভূমি এমন তিনটি গ্রাম। তাই লেখকের কাছে এটা বিস্ময়কর যে চার্ণক কি করে এমন একটা জায়গা পছন্দ করলেন। তিনি বোধ হয় অজান্তেই এই প্রাসাদ নগরীর স্থাপক।

তাছাড়া এ অধ্যায়ে (দ্বিতীয়) চার্ণকের সঙ্গে মোগল শাসকের বিবাদ ও শেষ পর্যন্ত একটা মিটমাটের কথা বলা আছে। চার্ণকের পরবর্তী যুগে কোম্পানী মোগল রাজপ্রতিনিধিদের সঙ্গে বন্ধুত্বপুর্ণ না হলেও মোটামুটি একটা ভাল সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এ সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত ভাল থাকেনি সিরাজ-উদ্-দৌলার সময়। লেখক সিরাজের প্রতি খুব একটা সহানুভূতিশীল নন। কিন্তু তিনি কোন সরাসরি মূল্যায়ন এড়িয়ে গেছেন (যদিও তিনি সিরাজের প্রথম জীবনের উচ্ছৃংখলতার কথা উল্লেখ করেছেন)। এর সম্ভাব্য কারণ হয়ত তিনি যখন এ বই লিখেছেন তখন বাঙালীর জাতীয়তাবোধ জাগছে, আর তিনি জাতীয়তাবাদীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। ব্ল্যাক হোল বা অন্ধকূপ হত্যা সম্বন্ধে তিনি প্রচলিত সাবেক মতবাদ গ্রহণ করেছেন। এর সত্যতা যাচাই করেননি। তবে সম্পাদক তাঁর টীকায় এ সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদের অবতারণা করেছেন। এজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। এছাড়া লেখক তাঁর পুর্বপুরুষ রাজা নবকৃষ্ণের তৎকালীন কার্যকলাপ বর্ণনা করেছেন। এ সম্বন্ধেও তিনি সরাসরি মূল্যায়ণ এড়িয়ে গেছেন। জাতীয়তাবাদীদের চোখে নবকৃষ্ণের তৎকালীন কার্যকলাপ ঘৃণ্য হলেও আধুনিক যুগের সামাজিক ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে ততটা নক্কারজনক নয়। তাঁকে বিশ্বাসঘাতক বলে আজকের ঐতিহাসিক হয়ত চিহ্নিত করবেন না। কারণ তখন এমন একটা যুগ যে সরাসরি কাউকে ভাল বা কাউকে খারাপ বলা যায় না। তাছাড়া ছিয়াত্তরের

CENTRAL LIBRARY

মন্বন্তর বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি হিকির লেখা থেকে একটা বড় উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কিন্তু এই হিকি, উইলিয়াম না জেমস অগাস্টাস, তা তিনি বলেন নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে উইলিয়াম হিকির স্মৃতি কথা তাঁর আকর গ্রন্থগুলির অন্যতম নয়।

তৃতীয় অধ্যায়ে লেখক কলকাতা নামের ব্যুৎপত্তি নিয়ে বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করেছেন। কিন্তু সমস্যার যে কোন সমাধান হয় নি, লেখক একথা নিজেই স্বীকার করেছেন। অবশ্য এ সম্বন্ধে বহু আলোচনা হয়েছে কিন্তু ঐক্যমত স্থাপিত হয় নি। তবে সম্পাদক যদি টীকায় এ নিয়ে আলোচনা করতেন তবে ভাল লাগত। এ অধ্যায়ে লেখক বাঙালার বিভিন্ন সময়ের রাজধানী ও তাদের উত্থান পতন নিয়ে একটা মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। এই আলোচনা থেকে একটা ব্যাপার স্পষ্ট নজরে পড়ার মত যে বাঙলার রাজধানী ক্রমে উত্তর থেকে দক্ষিণ বঙ্গে এসে উপনীত হয়েছে। এর সমাজতাত্ত্বিক কারণ কি সে সম্বন্ধে গবেষণার প্রচুর অবকাশ আছে।

কলকাতাকে যে কেন রাজধানী হিসেবে বেছে নেওয়া হল সে সম্বন্ধে নানা যুক্তি দেখানো হয়েছে (চতুর্থ অধ্যায়)। এর মধ্যে প্রধান কারণ হল ব্রটিশরা যখন এখানে ঘাঁটি গাড়ল। তখন এটাই ছিল বাণিজ্যের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধে-জনক জায়গা আর মারাঠাদের হাত থেকে নিরাপদ স্থান নির্বাচন যে ভুল হয়নি তার নিদর্শন মেলে এই ঘটনা থেকে যে কলকাতা ক্রমে ভারতের সবচেয়ে বড় বন্দর হিসেবে গড়ে উঠেছে। তবে, প্রথম যুগে কলকাতার স্বাস্থ্য যে ভাল ছিল না তা বোঝা কঠিন নয়। অ্যাটকিনসনের কবিতা' ক্যাপ্টেন হ্যামিলটনের স্মৃতিচারণ ও সমকালীন বিভিন্ন বিবরণ থেকে এ কথা জানা যায়। তবে আশ্চর্যের বিষয় এই যে আরও একশ বছর পর কলকাতায় আশপাশ থেকে লোকে হাওয়া বদল করতে আসত ম্যালেরিয়ার হাত থেকে বাঁচতে। এ ছাড়া এ অধ্যায়ে আরও বহু তথ্য আছে যা পাঠককে তখনকার অবস্থা বুঝতে সাহায্য করে।

পঞ্চম অধ্যায়ে লেখক কলকাতাবাসীর চরিত্রের প্রধান গুণ—সকলকে আপন করে নেওয়ার কথা বলেছেন। বাস্তবিক এর জন্য এখনও কলকাতার বহু সমস্যা থাকা সত্ত্বেও এই শহর মনুষ্যবাসের অযোগ্য হয়ে ওঠেনি। এ অধ্যায়ে লেখক কলকাতার এক অভিনব চরিত্রের কথা বলেছেন। তিনি হলেন কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট—

CENTRAL LIBRARY

যিনি তৎকালীন ইংরেজদের কাছে হিন্দু ষ্টুয়ার্ট বলে পরিচিত। বোধহয় ঐ সময়ে তিনি একথা প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন যে সবধর্ম একই লক্ষ্যে পৌঁছেছে। আজ তার সমাধি দক্ষিণ পার্ক ষ্ট্রীট কবরখানায় প্রায় ভগ্নাবস্থায় পড়ে আছে। কলকাতা-বাসীরা বোধহয় এঁর কথা জানে না।

কালিঘাটের বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে যে সেই সময়ে সাহেবরা অনেকেই এ মন্দিরে পুজো দিতে আসতেন। কিন্তু শুধু সাহেবরাই নয় উইলিয়াম ওয়ার্ডের মতে প্রতি বছর অন্তত: চারশ থেকে পাঁচশ মুসলমানও কালিঘাটের মন্দিরে পুজো দিত। কিন্তু এত গেল সাধারণ সাহেব ও মুসলমানদের কথা। জন ক্লার্ক মার্শম্যান তাঁর বইয়ে বলেছেন যে জন কোম্পানীর তরফ থেকে একটি দল কালি মন্দিরে পাঁচ হাজার টাকার পুজো দিয়েছে এবং বহু সহস্র লোক এর প্রত্যক্ষদর্শী।

আবার অপর দিকে এও উল্লেখযোগ্য যে মহারাজ নবকৃষ্ণ সেণ্ট জনস্ চার্চ তৈরী করার জন্য ছ' বিঘে জমি দিয়েছেন। হয়ত তখন ধর্মীয় বাড়াবাড়ি এতটা ছিল না। কারণ যদি বা নবকৃষ্ণ তাঁর ইংরেজ প্রভুদের সন্তুষ্ট করার জন্য চার্চ তৈরীতে জমি দিয়ে সাহায্য করেছেন কিন্তু এভাবে কোম্পানীর কালীঘাটে পুজো দেওয়াকে ব্যাখ্যা করা যায় না। আসলে তখনকার সাহেবরা এদেশে থেকে সাধারণ মানুষের অনেক কাছের লোক হয়ে উঠেছিলেন। তাদের ধর্মে হাত দেওয়া দুরে থাক তাঁরা নিজেরাই আধা ভারতীয় হয়ে উঠেছিলেন। বৃটিশরা বোধহয় তখনও পুরোপুরি শাসক হয়ে ওঠেনি আর পাদ্রীরাও তখন যীশুর ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারে ততটা উৎসাহী ছিলেন না। সেণ্ট জনস্ গীর্জার সংলগ্ন সমাধি-ক্ষেত্রে লেখকের মতে আর সকলের সঙ্গে চার্ণক ও তাঁর হিন্দু বিধবার (Charnock and his Hindu widow) সমাধি আছে। চার্ণকের সমাধি আছে ঠিকই। কিন্তু চার্ণকের পত্নী বা উপপত্নী হিন্দু ছিলেন কি না সে সম্বন্ধে ইতিহাসের স্বাক্ষ্য যথেষ্ট নয় (১৩৮৩ সালের শারদীয়া এক্ষণ পত্রিকায় প্রকাশিত রাধারমণ মিত্রের কলকাতার টুকিটাকি দ্রষ্টব্য)।

এই অধ্যায়ে যথেষ্ট বিস্তৃত ভাবে কলকাতার ধর্মীয়, সমাজকল্যাণমূলক ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির কথা আলোচিত হয়েছে। হিন্দু কলেজের স্থাপনা সম্বন্ধে অবশ্য লেখক তৎকালীন প্রচলিত মতবাদ অর্থাৎ বিচারপতি হাইড ইষ্টের কৃতিত্বের কথা বলেছেন। আধুনিক ঐতিহাসিকরা এ মত অস্বীকার করেন।

CENTRAL LIBRARY

অবশ্য এ সম্বন্ধে এই পত্রিকায় ও অন্যত্র বহু আলোচনা হয়েছে তাই নতুন করে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে সম্পাদক মহাশয় তাঁর টীকায় এ নিয়ে আলোচনা করলে পাঠকের উপকার হত।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক বলেছেন যে ব্যবসায়ের ইচ্ছেই ভৌগোলিক আবিষ্কারকে ত্বরান্বিত করেছিল। সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। বাঙলাদেশ সম্ভবত: এক সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব উন্নত ছিল। প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দরের ধ্বংসাবশেষ একথা প্রমাণ করে। হাণ্টারের মতে তাম্রলিপ্ত বন্দরের ধ্বংসাবশেষ এও প্রমাণকরে যে বাঙালীরা ক্রমে সমুদ্রযাত্রা থেকে বিরত হয়। তাই আমরা দেখতে পাই ইউরোপীয় বণিকেরা যখন এদেশে বাণিজ্য করতে আসে তখন বাঙলার বাণিজ্য সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বাঙলী তখন অ্যাড্‌ভেঞ্চার প্রবণতার বদলে চাষবাসের দিকে নজর দিয়েছিল। তাই ইউরোপীয়রা এদেশে এসে কাঁচা মালের বাজার হিসেবে এর যথেষ্ট সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছিল।

ইংরেজদের বাণিজ্যের প্রায় গোড়ার দিক থেকে কলকাতা এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। আসলে রাজনৈতিক কেন্দ্র বিন্দুতে আসার অনেক আগেই কলকাতা পূর্ব্ব ভারতের বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। লেখক কলকাতার ইংরেজদের বাণিজ্য বর্ণনা করতে গিয়ে অনেক পরিসংখ্যানের সাহায্য নিয়েছেন। ঐ পরিসংখ্যান ভাল করে লক্ষ্য করলে অনেক আকর্ষণীয় তথ্য পাওয়া যায়।

১৮০৫ সালে বিদেশ থেকে বাঙলায় আমদানী জিনিষের এক তালিকা থেকে জানা যায় সে ঐ বছর বিদেশ থেকে আমদানী অন্যান্য জিনিষের মধ্যে ছিল ৯০৫৫৬ সিক্কা টাকার বই, ১,১৬,২১৮ সিক্কা টাকার ঘোড়ার গাড়ী, ৭,৮৭,২৮৫ সিক্কা টাকার পানীয়, ২,৭৯,৫৭৫ সিক্কা টাকার কাঁচ ও হুরবীন ইত্যাদি। ঐ বছর বাঙলাদেশ থেকে রপ্তানী করা জিনিষের তালিকা ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এখান থেকে সমস্তই কাঁচা মাল পাঠান হয়েছিল। এই তালিকা থেকে তখনকার ধনী ও উচ্চ-মধ্যবিত্তদের চাহিদা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যেতে পারে। সেই সময়টা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহেবদের ও তাদের সহযোগী ধনী বাঙালীদের ভোগ বিলাসের চরম অবস্থা। এর কারণ হিসেবে দেখান যেতে পারে শহরবাসী বাঙালীদের জমিদারীতে বিনিয়োগ, বেনিয়ানী ও দেওয়ানগিরি। এই কাজে

CENTRAL LIBRARY

বাঙালীবাবুদের সাহেবদের সংস্পর্শে আসতে হত। তাই সাহেবদের অনুকরণে বিলাসবহুল জীবন যাপন করার প্রবণতা এদের পেয়ে বসেছিল। তাই বিদেশী জিনিষের চাহিদা বেড়ে গিয়েছিল। আর ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যত ছিলই। এই কাঁচা টাকা খরচ করার সহজ উপায় ছিল বিলাস বহুল জীবন যাপন। তাই তখনকার আমদানী জিনিষের মধ্যে আমরা এই বিলাস দ্রব্যের (luxury) প্রাচুর্য্য দেখতে পাই।

এই অধ্যায়ে আরও বলা আছে উনিশ শতকের প্রধান বন্দর হিসেবে কলকাতার সুবিধেজনক দিকের কথা। কলকাতা যে অন্তর্বাণিজ্যে বা বহির্বাণিজ্যে উনিশশতকে ভারতের অন্য সব বন্দরের চেয়ে এগিয়েছিল তার মূল কারণ হল অন্যান্য বন্দরের সঙ্গে জলপথে ও অভ্যন্তরের সঙ্গে স্থলপথে বা নদীপথে যোগাযোগের সুবিধে।

আঠের শতক ইংরেজদের ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে এক গুরুত্বপুর্ণ সময়। রাণী অ্যানের সময় ইয়োরোপের যুদ্ধে প্রচুর সোরা প্রয়োজন হয়। সস্তা অথচ ভাল সোরা পাওয়া যেত পাটনায়। পাটনাই সোরা ইয়োরোপের বাজারে চালান দেওয়া হত কলকাতা থেকে। তাই এই সময়ে ইয়োরোপের চাহিদা মেটাতে কলকাতা বন্দরের গুরুত্ব অনেক গুণে বেড়ে গেছে।

আরও অনেক চাঞ্চল্যকর খবর এ অধ্যায়ে আছে। কোম্পানীর কর্মচারীদের নীতিবোধ এ যুগে খুব উচুঁ ছিল না। যে কোন উপায়ে টাকা রোজগার করাই ছিল তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। উনিশ শতকের ইংরেজদের নীতিবোধ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে চারুচন্দ্র দত্ত বলেছেন—"ইংরেজ বাপ ছেলেকে কর্ম্মক্ষেত্রে পাঠাবার সময় এই বলে নাকি আশীর্ব্বাদ করতেন, দেখিস বাছা পয়সা রোজগার করিস। ধর্ম্মপথে থেকে পারিস তো খুব ভাল কথা, কিন্তু পয়সা আনাই চাই।" (পুরাণো কথা—চারুচন্দ্র দত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা ৫১, বিশ্বভারতী, ১৯৬৬)

আরও অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্যের মধ্যে একটি হল ১৭৬৫ সালের আগে গণিকাদের কাছ থেকে কর আদায় করা হত। সুলতানী যুগে সুদূর বিজয়নগর রাজ্যে ছাড়া এ ব্যবস্থা বোধহয় ভারতে আর ছিল না। পরে অবশ্য লর্ড ক্লাইভ এই কর তুলে দেন।

অধ্যায় শেষে লেখক ইয়োরোপীয় বণিকদের ভারতে বাণিজ্য সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা করেছেন। অবশ্য এর মধ্যে একটা গুরুত্বপুর্ণ খবর দিয়েছেন। উনিশ

CENTRAL LIBRARY

শতকের শেষ দিকে ভারতীয় বণিকরা মধ্য এশিয়ায় বাণিজ্য করত। ভারত বাণিজ্যে ইংরেজদের সাফল্যের কারণ হিসেবে লেখক অসীম ধৈর্য্য, একনিষ্ঠতা, পারস্পরিক বিশ্বাস ও স্বদেশবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থনকে দেখিয়েছেন। তাঁর মতে এই চারটি কারণে ভারতে ইংরেজশক্তির ভিত শক্ত হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে লেখক বাঙলাদেশের বিচারব্যবস্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। নবাবী আমলে বিচার ব্যবস্থা থেকে বৃটিশ বিচার ব্যবস্থার বিবর্ত্তন সম্বন্ধেও আলোচনা করেছেন। তিনি আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন—প্রথম সুপ্রীম কোর্টের সঙ্গে সরকারের বিরোধ। এটা হয়েছিল ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়। কাশীযোড়া মামলায় এ বিবাদ তুঙ্গে ওঠে। তবে হেস্টিংসের কৌশলে বিবাদের একটা সাময়িক নিষ্পত্তিতে আসা সম্ভব হয়। তাই দেখা যাচ্ছে, ভারতে বৃটিশ বিচার ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৃটেনে শাসক ও বিচারকের চিরন্তন বিবাদও এদেশে এসে পৌছচ্ছে। এটা ভারতে অভিনব। কারণ আগের মোগল যুগে বিচার ব্যবস্থা কোন সময়ই শাসকের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না।

বিচারব্যবস্থা আলোচনা করতে গিয়ে লেখক তাঁর বক্তব্য খুব পরিষ্কার করে রেখেছেন। তাঁর মতে বৃটিশ বিচার ব্যবস্থা যে শুধু ভালই করেছিল তা নয়, এর ফলে সাধারণ লোকের পক্ষে সুবিচার পাওয়া খুবই ব্যয়-সাপেক্ষ হয়ে পড়েছিল। তবে একটা নতুন শ্রেণী জন্মলাভ করেছিল। তারা হল উঠতি উকিল, অ্যাটর্নী' ব্যারিষ্টাররা। এই শ্রেণী সময় সাপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে একদিকে যেমন ধনবান হয়ে উঠল অন্যদিকে তেমনই সামাজিক প্রতিপত্তি লাভ করতে সক্ষম হল।

অষ্টম অধ্যায়ে কলকাতার সংবাদপত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক বলেছেন যে সংবাদপত্র আধুনিক সভ্যতাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। এ কথা সত্যি কারণ জনমত প্রভাবিত করতে সংবাদপত্রের চেয়ে বড় মাধ্যম আর নেই। ভারতবর্ষে আধুনিকতার অনেক ভাল ভাল উপাদানের মধ্যে একটি হল সংবাদপত্র যা বৃটিশরা এদেশে আমদানি করেছিল। উনিশ শতকের তথাকথিত নব জাগরণে সংবাদপত্রের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতা যুদ্ধেও সংবাদপত্র তার দায়িত্ব যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছে।

CENTRAL LIBRARY

একথা হয়ত অনেকেই জানে না যে ভারতের প্রথম সংবাদপত্র কলকাতাতেই প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্রটি হল ২৯ জানুয়ারী, ১৭৮০তে প্রকাশিত জেমস অগাষ্টাস্ হিকির বেঙ্গল গেজেট। যদিও সাংবাদিকতার মান উন্নত ছিল না। গরম গরম খবর পরিবেশন করেই সম্পাদক পাঠকের মনোরঞ্জন করতে চেয়েছিলেন। অবশ্য এর জন্য প্রচুর খেসারতও দিতে হয় সম্পাদক হিকিকে, এমন কি জেলে পর্য্যন্ত যেতে হয়। কিন্তু সেই সময় গভর্নরজেনারেলকে পর্য্যন্ত সমালোচনা করার যে সাহস হিকি দেখিয়েছিলেন তা বিংশ শতাব্দীর মাপকাঠিতেও প্রায় অবিশ্বাস্যের মধ্যে পড়ে। উইলিয়াম হিকির স্মৃতিকথায় এর মনোজ্ঞ বিবরণ আছে।

সেনসর ব্যবস্থা তখনকার সংবাদপত্রের ওপরও ছিল। এর মূল কারণ অবশ্যই ছিল বিপ্লবী ফ্রান্সের চিন্তাধারা যাতে এদেশে প্রবেশ করে জনগণের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করে। লর্ড ময়রা অবশ্য এ ব্যবস্থা পছন্দ করেননি। তাই তিনি এ ব্যবস্থা তুলে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু তিনি পুরোপুরি সফল হন নি। তবে তাঁর প্রয়াস প্রশংসাযোগ্য। ভারতীয় সংবাদপত্রের পক্ষে উল্লেখযোগ্য বছর হল ১৮৩৫। ঐ বছর লর্ড মেটকাফ সংবাদপত্রের ওপর থেকে অনেক বিধি নিষেধ তুলে দেন। তাই তাঁকে Liberator of Press বলা হয়। যদিও পরে সময়ে সময়ে সংবাদপত্রের ওপর সেনসর বিধি বলবৎ করা হয়। তবুও এর গতি স্তব্ধ করা সম্ভব হয় নি। এই অধ্যায়ে বাঙলা সংবাদপত্রের একটা তালিকা দেওয়া আছে। সম্পাদক তাঁর টীকায় ভ্রম সংশোধনের যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। এজন্য তিনি বর্ত্তমান সমালোচকের ধন্যবাদার্হ।

সংবাদপত্র ছাড়াও লেখক বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। এখানেও ভ্রম যথেষ্ট আছে। তবে সম্পাদক তাঁর টীকায় সেগুলি সংশোধনের প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসার অবকাশ রাখে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে এ অধ্যায়ে সম্পাদক মহাশয় অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পাদনা করেছেন। অনেক সময়ে সম্পাদনা মূল রচনার পরিপূরক হিসেবে কাজ করেছে।

আঠের ও উনিশ শতকের ইয়োরোপীয় সমাজের নীতিবোধ নিয়ে লিখতে গিয়ে লেখক বলেছেন যে সেইসময়ে সামাজিক মূল্যবোধ খুব উচু ছিল না। উচ্ছৃংখলতা মদ্যপান, নীতিহীনতা ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। আসলে সেই সময়কার

CENTRAL LIBRARY

ইয়োরোপীয়রা ছিল একেবারেই ভাগ্যান্বেষী। দেশে সুযোগ না পেয়ে তারা এদেশে এসেছিল যে কোন উপায়ে টাকা রোজগার করতে। তাই তাদের নীতির বালাই ছিল না। আসলে উইলিয়াম জোন্‌সের মত শিক্ষিত লোকেরা এদেশে আসতে আরম্ভ করেছেন আঠের শতকের শেষ দিক থেকে। তাও তাঁরা ছিলেন সংখ্যায় খুবই কম। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শেষভাগে অবশ্য সিভিল সার্ভেণ্টরা এদেশী ইয়োরোপীয়দের মান একটু উন্নত করেছিলেন।

ইংরেজসমাজ এদেশে নানা রকম আমোদ প্রমোদে ডুবে থাকতেন, আর আমোদের উপাদানও ছিল প্রচুর। তার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে এদেশে ইংরেজদের মৃত্যুর হার ছিল খুব বেশী। ডাক্তার ও আণ্ডারটেকারদের পশার দিন দিন বেড়ে উঠছিল। উচ্ছৃংখল আমোদের আরও একটা কুফল দেখা দিয়েছিল। তাহল বর্ণসংকর অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা। এদের অবস্থা ছিল ময়ুর পুচ্ছধারী দাঁড় কাকের মত। ভারতীয় বা ইয়োরোপীয় উভয় সমাজেই এরা ছিল outcaste। এদের সংখ্যা কিন্তু বেড়েই চলল এবং এখনও পর্যান্ত এটা একটা বিরাট সামাজিক সমস্যা। অবশ্য লেখক তাঁর লেখায় এর উল্লেখ করেন নি।

এ অধ্যায়ে একটা ব্যাপার খুব দুর্ভাগ্যজনক যে লেখক লঙের 'Calcutta in olden time' বই থেকে প্রচুর সাহায্য নিয়েছেন কিন্তু পাদটীকায় এর বিন্দুমাত্র উল্লেখ করেন নি। এটা সম্পাদকেরও নজর এড়িয়ে গেছে।

শেষ অধ্যায়ে লেখক হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা করেছেন। কিন্তু তৎকালীন কলকাতার ভারতীয় সমাজ নিয়ে আলোচনা এক্ষেত্রে অনেক সময়োপযোগী হত। কারণ কলকাতার ভারতীয় সমাজ তখন নতুনভাবে গড়ে উঠছে। নাগরিক সভ্যতায় সভ্য মানুষের সামাজিক চেতনা এবং মূল্যবোধ ও আঠের ও উনিশ শতকে তার বিবর্ত্তন নিয়ে অনেক লেখার অবকাশ ছিল। রাজা বিনয়কৃষ্ণ এমন একটি পরিবারের লোক যে পরিবার কলকাতার সংস্কৃতি ও বিবর্ত্তনের সাক্ষী। তাই এ বিষয়ে তাঁর মতামতের মূল্য অনেক। পাঠকরা এথেকে বঞ্চিত হলেন, এটা দুর্ভাগ্যজনক।

সাধারণ সমালোচনা হিসেবে একটা কথা বলা যায় যে এই বইএর আকর গ্রন্থগুলি সবই ইয়োরোপীয় লেখকদের লেখা। দেশীয় আকর যেমন তৎকালীন সাহিত্য, সংবাদপত্র, কুলগ্রন্থ ও অন্যান্য প্রাথমিক আকর যা শোভাবাজার

CENTRAL LIBRARY

পরিবারের গ্রন্থাগারে প্রচুর পরিমাণে ছিল তা ব্যবহার করলে আলোচনা এতটা একমুখী হত না। এই ত্রুটির জন্য বিনয়কৃষ্ণের কলকাতার ইতিহাস তৎকালীন ভ্রমণ সহায়ক পুস্তিকাগুলির স্তর পেরিয়ে কলকাতার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের স্তরে উন্নীত হতে পারেনি।

আরও একটা কথা বলা যায় যে সম্পাদনার ক্ষেত্রে সাহিত্য ও সংবাদপত্র সম্পর্কিত অধ্যায়ে সম্পাদক মহাশয় যতটা কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পাদনা করেছেন অন্য অধ্যায়ে ততটা নয়। অবশ্য এ ত্রুটি তাঁর কৃতিত্বকে খাটো করে না কারণ একটি সুখপাঠ্য বইকে তিনি বিস্মৃতির গর্ভ থেকে উদ্ধার করেছেন। এবং তাতে উপকার কলকাতা সম্বন্ধে উৎসাহী অগণিত পাঠকের। ঋদ্ধি প্রকাশিত এই সংস্করণ যথেষ্ট শোভন (যদিও শুদ্ধিপত্র থাকা সত্ত্বেও দু'চারটি মুদ্রণ প্রমাদ লক্ষ্য করা যায়)। এবং সম্পাদক মহাশয়ের বর্ত্তমান প্রয়াস প্রশংসার অবকাশ রাখে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারক গ্রন্থ : সম্পাদনা সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত প্রকাশক : সান্যাল প্রকাশন, ১৬ নবীন কুণ্ডু লেন। কলিকাতা-৯ দাম : ত্রিশ টাকা।

বাঙ্গালী একটি আত্মবিস্মৃত জাতি-এই অবিস্মরণীয় প্রবাদ বাক্যটির স্রষ্টা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তাই অবাক লাগে না বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও এশিয়াটিক সোসাইটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে ভুলে গেছে। দুঃখ হয় না এই ভেবে যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হরপ্রসাদ সম্পর্কে তাঁর জীবদ্দশায় নির্মম ছিল, আর এখন উদাসীন। তাঁর এই অতি পরিচিত উক্তিটি সংশোধনের প্রয়োজন আছে, নৈহাটির হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে প্রকাশিত এই স্মারক গ্রন্থটি হাতে না এলে তা বিশ্বাস করতাম না। শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও সর্বোপরি ঋজু ইতিহাস বোধ থাকলে, সরকারী পৃষ্টপোষকতা ব্যতিরেকেই, কিছু মহৎ কর্ম সম্ভব, পল্লব গ্রাহী গবেষক গোষ্ঠিকে এই সংকলন গ্রন্থটি তা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

এখানে গ্রন্থটি সম্পর্কে আলোচনা করছি না। সংক্ষিপ্ত পরিসরে পরিচয় দিচ্ছি। বহু এদেশী ও বিদেশী পণ্ডিতদের ও মনীষিদের হরপ্রসাদকে লেখা

CENTRAL LIBRARY

চিঠি স্মারকগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এদেশী মনীষিদের মধ্যে আছেন আবদুল করিম, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গঙ্গানাথ ঝা, ব্রজেন্দ্র নাথ শীল, কালীচরণ সেন. কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল, গণপতি শাস্ত্রী, যোগীন্দ্র নারায়ণ রায়, যোগেশ চন্দ্র রায়, পি কে দাশগুপ্ত, রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর ও মনমোহন চক্রবর্ত্তী। যে সমস্ত বিদেশী ভারতবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তিদের চিঠি এই গ্রন্থে আছে, তাঁরা হলেন সিলভা লেভী, সিসিল বেনডেল, য়ুলিউস য়োলি, জিলেম কালাণ্ড, ফ্রেডারিক এডেন পার্জিটার, লুই স্থ ভ্যালে পুসঁা, জে এ বার্দিলন শ্চেরবাট্স্কোই, হুর্বলে, রোপার লেথব্রিজ, জর্জ থিবো কে ও মিয়া. ডেনিসব রস, হারমান গোয়র্গ য়াকোবি, স্ট্রাঙ্গোয়েজ, কার্জন, ষ্টেন কনো, ষ্টেপলটন, কানকো সানো, আলফ্রেড ক্রফট, রোনাল্ডসে, গ্রিয়ার্সন, ম্যাকডোনেল, ফ্রেডরিক উইলিয়ম টমাস, এডওয়ার্ড আলবার্ট গেইট, রবার্ট লিটন। দার্জিলিঙ থেকে ১২।৬।৩১ তারিখে রবীন্দ্রনাথ হরপ্রসাদকে লিখেছেন, "বাংলা সাহিত্যে এতদিন ধরিয়া আমি যাহা কিছু করিয়াছি, তাহা সমগ্র ভাবে দেখবার শক্তি আপনার মত কয়জনের আছে।" (পৃ ৮১) আলফ্রেড ক্রফট ১৯২৪ সালের ৭মে তারিখে রামলে থেকে লিখেছেন, The men in fact live in your pages and that is the way that history should be written, if in its turn it also desires to live" (পৃ ৮৭) ইতিহাসের পাতায় কি মানুষের প্রাণস্পন্দন অনুভব করা যায়? হরপ্রসাদ নিজে তা অনুভব করেছেন, আমাদের করিয়েছেন। শুধুমাত্র পাথুরে প্রমাণ নির্ভর ও দলিল নির্ভর "বৈজ্ঞানিক" ইতিহাসের কৌলিন্যে এ যুগের ইতিহাসসেবীরা বিশ্বাসী। হরপ্রসাদের মানবিক ইতিহাসবোধ হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে তাদের সামগ্রিক চেতনা ও ইতিহাস-চর্চা সমৃদ্ধ হত।

হরপ্রসাদ সম্পর্কে স্মৃতিকথা লিখেছেন ননীগোপাল মজুমদার, রাধাগোবিন্দ বসাক, রমেশচন্দ্র মজুমদার, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ ও আরও অনেকে। তাঁর সাধনা ও সৃষ্টির যারা মূল্যায়ন করেছেন, তাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোপীনাথ কবিরাজ, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, সুশীল কুমার দে, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, সুকুমার সেন, দীনেশ চন্দ্র সরকার, গোপাল হালদার ও ভবতোষ দত্ত বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থে সবচেয়ে আকর্ষনীয় হল হরপ্রসাদের রচনাপঞ্জী। এই গ্রন্থ প্রকাশের পুর্বে আমরা কখনও কি জানতে পেরেছি যে তাঁর বিচিত্র রচনা সম্ভার তালিকায় সর্বশেষ

CENTRAL LIBRARY

ক্রমিক সংখ্যা ৪০২। নৈহাটির এই গবেষণাকেন্দ্রটি তাঁর রচনাবলী প্রকাশের জন্য আগ্রহী। বলা বাহুল্য, আমরা এর জন্য উন্মুখ হয়ে আছি। নৈহাটী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গবেষণা কেন্দ্র এই স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করে একটি মহৎ জাতীয় দায়িত্ব পালন করলেন। "ঐতিহাসিক" পত্রিকার পাঠকদের কাছে এই অসামান্য গ্রন্থের যৎসামান্য পরিচয় দিয়ে আমি নিজেও পরম তৃপ্তি ও গর্ব অনুভব করছি।

জহর সেন

সুভাষ চন্দ্র ও ব্রহ্মদেশ : অশোক মুস্তাফি সুভাষ স্কুল অব সোস্যাল এণ্ড পলিটিকাল ষ্টাডিজ। কলিকাতা।১৯৭৮

ভূমিকাতে রমেশচন্দ্র মজুমদার যথার্থই বলেছেন যে "অনেক নূতন তথ্য" এই গ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, বিশেষ করে বর্মা সম্পর্কে সুভাষ চন্দ্রের মতামত এই বইটির নানাস্থানে ছড়িয়ে আছে। মূল্যবান গ্রন্থ পঞ্জী (ইংরাজী ও বাংলা ভাষায়) এই গ্রন্থটির একটি প্রধান আকর্ষণ। বর্মা ডাইজেষ্ট, ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেট, ফরওয়ার্ড, লিবার্টি, নেশন প্রভৃতি পত্রপত্রিকা থেকে বিস্মৃতির গর্ভে বিলুপ্ত অনেক তথ্য উদ্ধার করে এই গ্রন্থে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে।

চল্লিশ পাতার প্রস্তাবনা আছে। প্রস্তাবনা দশটি অংশে বিভক্ত। ১৯২৪ থেকে ১৯৪৫ সালের কালসীমায় একটি পরিমণ্ডল তৈরী করা হয়েছে। এই পরিমণ্ডলের কেন্দ্রে সুভাষচন্দ্র। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মান্দালয় জেলে তার বন্দী জীবনের কথা বলা হয়েছে। লেখকের নিশ্চিত বিশ্বাস যে "মানস লোকের ক্রম বিবর্তনে" বিশেষ করে গঠনতান্ত্রিক চিন্তা ভাবনার বিকাশ সাধনে মান্দালয় কারাজীবনের একটি স্পষ্ট ভূমিকা আছে।" প্রথম পরিচ্ছেদে লেখক স্বরাষ্ট্র দপ্তরের একটি গোপন দলিল উল্লেখ করে আমাদের জানিয়েছেন যে সুভাষচন্দ্র ১৯৩৭ সালে চীন সফরের একটি পরিকল্পনা করেন কিন্তু ভারত সরকারের গোয়েন্দা দপ্তরের আপত্তি ছিল বলে তার যাওয়া হয়নি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ভারত ও বর্মার জাতীয় আন্দোলনের সমান্তরাল ধারার খুব উজ্জ্বল এক রেখাচিত্র পাওয়া যায়।

CENTRAL LIBRARY

তৃতীয় পরিচ্ছেদে মান্দালয় জেল থেকে সুভাষচন্দ্র লিখিত চিঠিপত্রের বিচিত্র সম্ভার সাজানো হয়েছে। যাদের তিনি চিঠি লিখেছিলেন তাদের মধ্যে আছেন শরৎচন্দ্র বসু, বিভাবতী বসু, দিলীপ কুমার রায়, হরিচরণ বাগচী, অনিল বিশ্বাস, ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাসন্তী দেবী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে সুভাষচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য আমরা বোধ করি। ১৯২৬ সালে হরিচরণ বাবুকে এক চিঠিতে তিনি লিখছেন, "রাজনীতির স্রোত ক্রমশঃ যে রূপ পাঙ্কিল হইয়া আসিতেছে, তাহাতে মনে হয় যে অন্তত কিছু কালের জন্য রাজনীতির ক্ষেত্রের দিয়া দেশের কোন উপকার হইবে না।" ইদানীং কালের রাজনীতির চেহারা দেখলে তিনি কি ভাবতেন?

চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রহ্মদেশে আজাদহিন্দ ফৌজের ভূমিকার মূল্যায়ন করা হয়েছে। নতুন কোন তথ্য সংযোজিত হয় নি। প্রকাশিত তথ্যাদি বিচার বিশ্লেষণ করে আজাদ হিন্দ ফৌজ ও সুভাষচন্দ্রের গৌরবময় ভূমিকা উল্লেখ করা হয়েছে।

বইটি শেষ করার পর মনে কিছু কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। যেমন বর্মার মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের কি স্পষ্ট ধারণা ছিল? তদানীন্তন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে জাগ্রত কুম্যুনিষ্ট আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্ক তিনি কি সম্যক অবহিত ছিলেন? সে সব অঞ্চলের, বিশেষ করে ব্রহ্মদেশের নেতৃবৃন্দের অনেকের সঙ্গেই তিনি প্রত্যক্ষ পরিচিত ছিলেন। তাদের সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র কি ধারণা পোষণ করতেন? লেখকের অনুসন্ধিৎসা ও বিষয় নিষ্ঠা এই বইটিতে খুবই স্পষ্ট। আর একটু তৎপর হলে তিনি নিঃসন্দেহে এ সব বিষয়ে আমাদের তৃষ্ণা মেটাতে পারবেন।

জহর সেন

নকশালবাদী রাজনীতির বিভিন্ন ধারা :
তরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
পরিবেশক : উচ্চারণ, ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৯। ১৯৭৮। মূল্য ১২.০০।

অতীত ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থাদি ও পত্রপত্রিকার আলোচনা "ঐতিহাসিক"

CENTRAL LIBRARY

পত্রিকার পুস্তক পরিচয় বিভাগে প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য বইটি অনতি অতীতও নয়, অতি সাম্প্রতিক কালের একটি আন্দোলনের শতধা বিচ্ছিন্ন রূপটি দেখাবার চেষ্টা করেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই ধরণের আলোচনা সঙ্গত ও গ্রাহ্য। কিন্তু ইতিহাসের দৃষ্টিকোণে (যেখানে একটি সুদূরপ্রসারিত প্রেক্ষপটের প্রয়োজন) নকশাল আন্দোলনের বিচার বিশ্লেষণের উপযুক্ত সময় এখনো আসে নি। অবশ্য এই গ্রন্থে সে প্রয়াস ও প্রচেষ্টা অনুপস্থিত।

এ কথা মনে রাখা ভাল যে বাংলা ভাষায় নকশাল আন্দোলনের দলিল ভিত্তিক সার্থক রূপরেখা এই প্রথম আমরা পেলাম। ভবিষ্যতে যখন ইতিহাসের ছাত্ররা এই আন্দোলনের নানা ধারা বিচার বিশ্লেষণ করবে, তার প্রকৃতি ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য অন্বেষণ করবে, এই বইটি, তাদের কাছে সন্নিধিষ্ট দলিলপত্রাদির জন্য, অবশ্য পাঠ্যরূপে বিবেচিত হবে। ১৯৬৭ সালে মার্চ মাসে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে কয়েকটি রাজ্যে কংগ্রেস দলের পরাজয় ঘটে। বইটির মূল আলোচনা এখান থেকেই সুরু হয়েছে। সি. পি. আই. (এম. এল.) এর কেন্দ্রীয় কমিটির (মহাদেব মুখার্জী গোষ্ঠির) মুখপত্র "দেশব্রতী"র ১৯৭৮ সালের মার্চ মাসের সম্পাদকীয় এই বইটির পরিশিষ্টে শেষ দলিল হিসাবে সংযোজন করা হয়েছে। এখানেই বইটির আলোচনাও সমাপ্ত। অর্থাৎ ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত কাল পরিধিতে বইটির আলোচনা সীমাবদ্ধ।

পরবর্ত্তী সংস্করণের জন্য লেখককে কয়েকটি কথা জানিয়ে রাখি। বইটি অধ্যায়ে বিভক্ত নয়। হয়ত এই কারণেই বিষয়সূচী দেওয়া হয় নি। বিষয়বস্তুর বিচারে বা কালানুক্রমিক বিচারে অধ্যায়ে বিভক্ত করা উচিত ছিল। বইটি পড়তে পড়তে প্রশ্ন জাগে অন্যান্য মার্কসবাদী দল এই আন্দোলন সম্পর্কে ঠিক কি ধরণের মতামত পোষণ করতো। এই বিষয়ে দলিল পত্রাদি অপ্রতুল নয়। পুলিশের দপ্তরে নকশাল আন্দোলন সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপুর্ণ দলিল আছে। তাছাড়া বিচার বিভাগীয় উচ্চপদের কর্মচারীদের কাছে বেশ কিছু সংখ্যক কর্মী নানা ধরণের স্বীকারোক্তি দিয়েছে। ভবিষ্যতে গবেষকদের কাছে এই সব দলিল অধিগম্য হলে নকশাল আন্দোলনের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সম্ভব হবে। এই আন্দোলনের সঙ্গে যারা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, তাদের কাছ থেকে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে সংগৃহীত বিবরণও এ বিষয়ে আলোকপাত করবে।

জহর সেন

CENTRAL LIBRARY

এনসিয়েন্ট ইণ্ডিয়ান সোশাল হিস্টি : রোমিলা থাপার, ওরিয়েণ্ট লংম্যান, ১৯৭৮, ৭৫ টাকা।

ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে সামাজিক ইতিহাস বিষয়টি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ফলে ট্রেভেলিয়ান তাঁর ইংল্যাণ্ডের সামাজিক ইতিহাস রচনার আগে বিষয়টির সংজ্ঞা নির্দেশ জরুরী মনে করে বলেছিলেন—সামাজিক ইতিহাস হ'লো একটি মানব সম্প্রদায়ের ইতিহাস, রাজনীতিটুকু বাদ দিয়ে। এই নেতিবাচক প্রকরণ অনুসরণের জন্য ট্রেভেলিয়ান তাঁর কৈফিয়ৎ ও দাখিল করেছেন। ওঁর বক্তব্য কোনো সম্প্রদায়ের কথাই রাজনীতি বাদ দিয়ে লেখা যায় না, তবে কেবলমাত্র রাজনৈতিক ইতিহাসের অনুশীলনই এতোদিন ধরে হ'য়ে এসেছে বলে, ওটা বাদ দিয়ে সামাজিক কাঠামোর অন্যান্য প্রসঙ্গে দৃষ্টি দিলে মোটের ওপর পাল্লা সমান থাকবে। ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা সম্পর্কে ঐ একই কথা প্রযোজ্য তবে ভারতের, বিশেষ করে প্রাচীন ভারতের সামাজিক ইতিহাস অনুসন্ধান বয়সে এখনো নিতান্ত শিশু। এ বিষয়ে যাদের প্রয়াস সর্বাগ্রে মনে পড়ে তাঁদের অন্যতম রোমিলা থাপারের চোদ্দটি প্রবন্ধের সমাহার এই নতুন বইটি।

বিষয়টি যেহেতু নতুন এবং অত্যন্ত ব্যাপক তাই চোদ্দটি প্রবন্ধে তার সবদিক আলোচনা করার প্রশ্ন ওঠে না এবং সে চেষ্টাও লেখিকা করেন নি। কারণ বইটি প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের কোনো কালানুক্রমিক এবং পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত ইতিহাস নয়, একেকটি প্রবন্ধে একেকটি বিষয় আলোচিত হয়েছে। বিষয়বস্তুর ঐক্য মাত্র একজায়গাতেই—সবকটি প্রবন্ধই প্রাচীন ভারতের সমাজিক ইতিহাস এই জটিল ও বহু বিস্তৃত বিষয়টির অন্তর্গত।

সামগ্রিক ভাবে প্রাচীন ভারতের সামাজিক ইতিহাসের প্রধান বিবেচ্য বিষয় বলাতে লেখিকা কি বোঝেন তা তিনি প্রথম প্রবন্ধেই অল্প কথায় স্পষ্ট করে বলেছেন : প্রাচীন ভারতীয় আক্ষিকের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কগুলির প্রকৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান। এখনো পর্যন্ত প্রাচীন ভারতের সামাজিক ইতিহাসচর্চা প্রধানত: জমিদান প্রথা এবং বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার আলোচনাতেই সীমিত আছে। বড়জোর সামন্ততন্ত্র প্রসঙ্গ ওঠে কিন্তু এর খুব বেশী কিছু নয়। ফলে সামাজিক ইতিহাসের অনেক বই তথ্যগত ভাবে সমৃদ্ধ এবং সার্থক হলেও কিছুটা পুনরাবৃত্তির দোষে বর্ণহীন। এই প্রবন্ধগুলিতে তথ্যের ব্যবহারে নৈপুণ্য

CENTRAL LIBRARY

তো আছেই কিন্তু বইটির প্রধান ঐশ্বর্য ও আকর্ষণ হলো এর বিষয়বৈচিত্র্য। এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন যা এর আগে কেউ ভাবেন নি, যেমন পুরাণের বংশসতিকা থেকে সামাজিক ইতিহাসের তথ্যসংগ্রহ। বহুপরিচিত বিষয়কে নতুন দৃষ্টি কোণ থেকে বিচার করেছেন, যেমন সন্ন্যাসের ত্যাগের আদর্শকে উনি সমাজের একটি সমান্তরাল প্রতি সংস্কৃতি হিসেবে দেখেছেন। কিংবা দান ও দক্ষিণা এই ধর্মীয় আচারের মধ্যে উনি খুঁজে পেয়েছেন প্রথাসিদ্ধ অর্থনৈতিক ব্যবহার। আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার প্রবণতা ইদানীং বাড়ছে। প্রচলিত যুগবিন্যাস যে সব অঞ্চলের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য নয়, অঞ্চল বিশেষে বর্ণ ও জাতি ব্যবস্থারও যে বিভিন্নতা ঘটে এমন দরকারী কথা উনি গবেষকদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আলোচনা করেছেন প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস রচনার ধারা নিয়ে; ভিনসেণ্ট, স্মিথের শাসক চেতনাকে পি জয়সোয়ালের জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, ডি ডি কোসাম্বীর মার্কসীয় চিন্তাধারা এসব পর্যায়ক্রমে কিভাবে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস রচনার ধারাকে প্রভাবিত করেছে তার উল্লেখ করেছেন। একাধিক প্রবন্ধে বিশেষ করে জোর দিয়েছেন প্রাচীন ভারতের সামাজিক ইতিহাস পুনর্গঠনে প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য ব্যবহারের গুরুত্বের ওপর। ঐ রাজনীতিটুকু বাদ দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের আর সব কটি দিকেরই কোনো না কোন অংশ উনি ওর অপক্ষপাত সন্ধানী মনন দিয়ে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন।

এই প্রবন্ধগুলির প্রত্যেকটিই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বেরিয়েছিল, তবু বই আকারে প্রকাশ এগুলিকে পাঠক সাধারণের কাছে সুলভ করল। ওর বক্তব্য নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে, কিন্তু উনি যা করেছেন তাকে সাধুবাদ দিতেই হয়—প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রকে উনি প্রসারিত করে দিয়েছেন।

কুণাল চক্রবর্ত্তী

CENTRAL LIBRARY

সুরেন্দ্রনাথের পদচ্যুতি

অনিমেষ চক্রবর্ত্তী

'ঐতিহাসিক' প্রবন্ধ সংকলনের পঞ্চম সংখ্যায় (এপ্রিল, ১৯৭৮) ডঃ নিখিল সুর 'আই. সি. এস সুরেন্দ্রনাথ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধটির মূল উদ্দেশ্য ছিল, যে মামলা পরিচালনার ত্রুটির দায়ে এবং অন্যান্য অভিযোগের ভিত্তিতে সুরেন্দ্রনাথকে আই, সি, এস পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, তার একটি তথ্য ভিত্তিক বিবরণ প্রকাশ করা। ডঃ সুরের মুখ্য উপাদান ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য লেখ্যাগারে রক্ষিত তিনটি অনাবিষ্কৃত ফাইল।

সুরেন্দ্রনাথের পদচ্যুতি সম্বন্ধীয় কিছু নথিপত্র নূতন দিল্লীর জাতীয় অভিলেখ্যাগারেও সংরক্ষিত আছে। সেগুলো রাজ্য লেখ্যাগারের সংরক্ষণের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। এছাড়াও সম্প্রতি জাতীয় অভিলেখ্যাগারের কর্তৃপক্ষ লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস থেকে তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড নর্থব্রুকের ব্যক্তিগত পত্রাদির মাইক্রোফিলম্ সংগ্রহ করেছেন। ফলে এসব উপাদানের সাহায্যে ডঃ সুর লিখিত প্রবন্ধের সংগে এ বিষয়েই আরো কিছু সংযোজন করা সম্ভব। বর্তমান প্রবন্ধ সেই প্রচেষ্টারই পরিণাম।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তার উন্মেষে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথের অবদান কতখানি তা আলোচনা করার প্রয়োজন এখানে নেই। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথকে ঘিরে এমন একটা halo সৃষ্টি হয়ে রয়েছে যেটা ঐতিহাসিক সত্য উৎঘাটনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শুধু মাত্র সুরেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেই নয়, জাতীয় আন্দোলনের বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস গবেষণা সাম্প্রতিক ঐতিহাসিকদের অত্যন্ত প্রিয় বিষয়বস্তু। লব্ধ প্রতিষ্ঠ প্রবীণ ঐতিহাসিক থেকে সুরু করে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী আকাঙ্ক্ষী অনেক ঐতিহাসিকই এবিষয়ে গবেষণা করে তাঁদের মূল্যবান পুস্তক আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু

CENTRAL LIBRARY

দুর্ভাগ্যের বিষয় সুরেন্দ্রনাথের আই. সি. এস. পরবর্ত্তী জীবনের কর্মধারার দ্বারা এঁরা এতই প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন যে সুরেন্দ্রনাথের পদচ্যুতি বিষয়ক সরকারী নথিপত্র ঘেঁটে দেখার প্রয়োজন বোধ করেননি। সবাই একই পথ অনুসরণ করে সুরেন্দ্রনাথের পদচ্যুতি বিষয়ক বয়ানটার জন্য নির্ভর করেছেন সুরেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী; 'A Nation in Making' এর উপর এবং সুরেন্দ্রনাথ সেখানে যা বলেছিলেন, তাই নির্বিচারে গ্রহণ করেছেন। ড: সুরই প্রথম দেখালেন, সুরেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর বক্তব্য এবং সরকারী নথীপত্রে প্রাপ্ত বক্তব্যের মধ্যে ব্যবধানটা কোথায় ; কোনটা যুক্তিসংগত, সত্যনির্ভর এবং বিশ্বাসযোগ্য মনে হতে পারে।

১

স্বাধীনতা সংগ্রামে সুরেন্দ্রনাথের হয়ত বিরাট ভূমিকা ছিল। একদা সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বের নিশ্চয়ই ভারত ব্যাপী মোহ না হলেও বঙ্গদেশব্যাপী মোহ ছিল। তাই তৎকালীন যুবকরা তাঁর গাড়ী থেকে ঘোড়া সরিয়ে ঘোড়ার ভূমিকা পরম উৎসাহে পালন করেছিল। কিন্তু আই. সি. এস হিসেবে সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন অযোগ্য। শুধুমাত্র চাকরী জীবনেই নয়, চাকরীর প্রবেশিকা পরীক্ষাতেও সুরেন্দ্রনাথ এমন একটা অস্বাভাবিক কৃতিত্বের প্রমাণ দিতে পারেন নি। ১৮৬৯ সালে যে চারজন১ ভারতীয় বিলেতে কভেন্যাণ্টেড সিবিল সার্ভিসের প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তার মধ্যে সামগ্রিক তালিকায় সুরেন্দ্রনাথের অবস্থান ছিল আটত্রিশতম। ঐ পরীক্ষাতেই রমেশচন্দ্র দত্তের স্থান ছিল তৃতীয় এবং বিহারীলাল গুপ্তের চতুর্দ্দশ।২ দুবছর পরে, ১৮৭১ সালে অনুষ্ঠিত সিবিল সার্ভিসের শেষ পরীক্ষায় নির্ব্বাচিত ৪৮ জন প্রতিযোগীর মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের অবস্থান দ্বাবিংশ ; সেখানে রমেশচন্দ্রের দ্বিতীয় এবং বিহারীলালের চতুর্থ।৩ ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত কভেন্যাণ্টেড সিবিল সার্ভিসে ভারতীয় ছিলেন মাত্র পাঁচজন, এঁদের মধ্যে একমাত্র সুরেন্দ্রনাথকেই চাকরী থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল মাত্র আড়াইবছর চাকরী জীবনের পর, অথচ বাকীরা চাকরী করেছিলেন আরো বহু বছর সুনামের সংগে।

যে কোন সরকারী চাকুরিয়ারই যোগ্যতার নির্ণয় হয় উর্ধতন কর্তৃপক্ষের অভিমতের উপর। বলাবাহুল্য, সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে সরকারী কর্তৃপক্ষের ধারণা ছিল খুবই খারাপ। বঙ্গীয় সরকারের ভাষায়, '...though endowed with

CENTRAL LIBRARY

good abilities, Mr. Banerjea is a bad officer,—not in respects of those things, which might be set down to youth and inexperience, but in respect of application' accuracy, and conscientious discharge of duty—qualities which may be expected from a young as well as from an old officer'.৪ সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি তদন্ত করার জন্য যে কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল, তাঁরাও সুরেন্দ্রনাথের সরকারী কাজে গাফিলতি এবং অমনোযোগীতার বহু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছিলেন। তাঁরাও মন্তব্য করেছিলেন, '...an extraordinary careless habit and want of accuracy that seems unfortunately to be natural to Mr. Banerjea, both in his judicial work and his correspondence'।৫ কমিশন সুরেন্দ্রনাথের আরো একটি ত্রুটি লক্ষ্য করেছিলেন। সেটি হোল, সরাসরি বা Straight forward উত্তর প্রদানে অনীহা।৬ চাকরী জীবনের ঐ আড়াই বছরের মধ্যে বা তারপুর্ব্বে ছাত্রাবস্থায় সুরেন্দ্রনাথের কার্য্যকলাপে এমন কোন ঘটনা নেই, যাকে বলা যেতে পারে সরকার বা বৃটিশ বিরোধী। সুতরাং সুরেন্দ্রনাথের প্রতি সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের বিরূপ মনোভাবের কারণ শুধুমাত্র তাঁর সরকারী কাজে গাফিলতি ছাড়া অন্য কিছু নয়।

যে মামলাটি পরিচালনায় সুরেন্দ্রনাথ যথাযত কর্তব্য পালন করেননি এবং তদন্তকারী কমিশন সে চৌদ্দটি অভিযোগের তদন্ত করেছিলেন, সে সম্বন্ধে ডঃ সুর তাঁর প্রবন্ধে বিশদভাবেই আলোচনা করেছেন। তবুও দু'একটি বিষয় হয়ত তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে, অথবা সংক্ষেপ করার প্রয়োজনে উল্লেখ করেননি। যেমন, প্রথমেই বলা যেতে পারে সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আনীত চৌদ্দটি অভিযোগ সম্পর্কে। বঙ্গীয় সরকারের মাথায় প্রথমেই ঐ চৌদ্দটি অভিযোগের চিন্তা আসেনি। বঙ্গীয় সরকার সাধারণ অপারদর্শীতার বা ছোটখাট ভুল ত্রুটির জন্য সুরেন্দ্রনাথকে বিচার করতে চাননি, একটি বা দু'টি নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর বিচার সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সরকারী কৌঁসুলী একজন পাকা-আইন ব্যবসায়ীর মত চেয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথকে একটা শক্ত জালে বাঁধতে। তাই সরকারী কৌঁসুলী O' Kinealy সাহেব বহু নথিপত্র ঘেঁটে সুরেন্দ্রনাথের আরো বহু ত্রুটি খুঁজে বের করে তাঁর বিরুদ্ধে মোট চৌদ্দটি অভিযোগ দাঁড় করান।৭

CENTRAL LIBRARY

দ্বিতীয়তঃ ডঃ সুর এক জায়গায় বলেছেন, '...ভারত সরকার ইংল্যাণ্ডের ভারত সচিবকে জানালেন, সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একটি মাত্র অভিযোগ ছাড়া আর সবই প্রমাণিত'।৮ অথচ অন্যত্র লিখলেন, '... কমিশন তৃতীয় অভিযোগটি স্বীকার করেননি। আর প্রথম এবং দ্বিতীয় অভিযোগ দু'টি তুলনামূলক ভাবে লঘু হওয়ায় ভারত সরকার তেমন গুরুত্ব দেননি। সুতরাং চৌদ্দটির মধ্যে এগারটি অভিযোগ কমিশনের মতে প্রমাণিত।'৯ এগারটি নয়, কমিশন তেরটি অভিযোগই প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। ভারত সরকার প্রথম এবং দ্বিতীয় অভিযোগ দু'টিকে কম গুরুত্ব দিয়েছিলেন, এ কথাটা বলা হয়ত ঠিক নয়। বঙ্গীয় সরকারের বক্তব্য ছিল, প্রথম দুটি অভিযোগ (অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্ব্বক মামলার বিলম্ব ঘটানো এবং প্রথমে মৌখিক রায়দান পরে তারিখ পিছিয়ে লিখিত রায়দান) ঠিক নির্দিষ্ট অভিযোগের পর্য্যায়ে পড়ে না। এগুলি অনেকটা সাধারণ প্রকৃতির ত্রুটি। এ দু'টি অভিযোগ সম্পর্কে বঙ্গীয় সরকার এবং হাইকোর্ট পূর্ব্ব থেকেই অভিহিত ছিল।১০ ভারত সরকারও কমিশনের মত থেকে অন্যমত পোষণ করতে পারেননি এবং তাঁদের মতেও '...all the charges, except one, are proved'. তবে ৫, ৬, ৮ এবং ৯ নং অভিযোগগুলিই হোল সবচেয়ে গুরুতর, কারণ এগুলো হোল '...palpable abuse by Mr Surendra Nath Banerjea of his judicial powers, and the infliction by him of injustice on innocent persons for the purpose of screening his own faults.'১১

বর্ত্তমান প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য, আমি প্রথমেই বলেছি, ডঃ সুর লিখিত প্রবন্ধটির সংগে কিছু সংযোজন। অতএব ডঃ সুরের প্রবন্ধে যা প্রায় অনুল্লেখই রয়ে গিয়েছে, তা' উল্লেখ করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বিষয়টি হোল, সুরেন্দ্রনাথকে আই. সি. এস পদ থেকে বহিষ্কার করার পর তিনি যে আর্জি ভারত সচিবের কাছে পাঠিয়েছিলেন, তাতে তাঁর বক্তব্য কি ছিল, এবং সেই আর্জির উপরে বঙ্গীয় সরকার এবং ভারত সরকারই বা কি মন্তব্য করেছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ প্রথমেই উল্লেখ করেছিলেন, যদিও বা তিনি একজন 'Native Indian subject' হিসেবে কোন বিশেষ সুবিধা চাইছেন না, তবুও ভারত সচিব যেন বিবেচনা করে দেখেন, একজন নেটিভের পক্ষে এই সর্ব্বোচ্চ কর্মলাভ এবং এই কর্মলাভের জন্য তাঁকে কত অর্থব্যয়, কত বাধাবিঘ্ন ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সুতরাং তিনি এ জন্যই তাঁর ত্রুটিগুলিকে ক্ষমার চোখে দেখার

CENTRAL LIBRARY

জন্য ভারত সচিবের কাছে কিছুটা প্রশ্রয় ভিক্ষা করছেন। কমিশনের কাছে জবাব দেবার সময় সুরেন্দ্রনাথ যা' করেছিলেন, এ ক্ষেত্রেও ঠিক অনুরূপ ভাবেই তিনি প্রতিটি অভিযোগ সম্পর্কে সরাসরি কোন বক্তব্য রাখেননি। তিনি যা' কিছু বলেছিলেন, তা ৪, ৯ এবং ১০ নং অভিযোগ সম্বন্ধেই। তাঁর মতে অন্যান্য অভিযোগগুলির জন্ম হয়েছে ঐ তিনটি অভিযোগ থেকেই। অতএব তাঁর ভাষায়, 'that if in respect of those charges Your Lordship should be of opinion that they are not supported by the weight of evidence, the other charges would naturally fall under the same conclusion.' তবে সুরেন্দ্রনাথ এই তিনটি অভিযোগ সম্পর্কে কমিশনের কাছে যে বক্তব্য রেখেছিলেন, এই আর্জিতে নিবেদিত বক্তব্যও ছিল হুবুহু একই। যুধিষ্ঠির এবং শরতের মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর যে ত্রুটি হয়েছিল তা' তিনি স্বীকার করছেন। ('That there was not a failure of justice in that case, I shall not... contend,...I may humbly admit, some mistakes in the procedure caused the long delay in deciding the case') তবে ফেরারী আদেশে যে তাঁর অজ্ঞাতসারেই সই নেওয়া হয়েছিল, তা তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন।১২ কিন্তু এ বক্তব্য পুরোনো। তাই দেখি, সুরেন্দ্রনাথের আর্জির উপরে নোট আকারে লর্ড নর্থব্রুক তাঁর পর্ষদের সদস্য হবহাউসকে জিজ্ঞেস করছেন, তিনি এই আর্জিতে নূতন কিছু পেয়েছেন কিনা। ঐ নোটের উত্তরে হবহাউস নোট দিচ্ছেন, প্রধানতঃ যে তিনটি অভিযোগের ভিত্তিতে ভারত সরকার সুরেন্দ্রনাথকে পদচ্যুত করতে চেয়েছিলেন সেই তিনটি অভিযোগ, অর্থাৎ ৫, ৬, এবং ৯ নং অভিযোগ সম্বন্ধে Mr. Banerjea's petition does not touch'.১৩ সুতরাং ভারত সরকারের এই অভিমতসহ সুরেন্দ্রনাথের আবেদন পাঠানো হয়েছিল ভারত সচিবের কাছে।১৪ বলাবাহুল্য, ভারত সচিব এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন১৫ এবারও তা থেকে বিচ্যুত হননি। ফলে সুরেন্দ্রনাথ আই. সি. এস পদ থেকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা পেনসন সহ চিরতরে বহিষ্কৃত হন।

২

এখন একটি প্রশ্ন তোলা বোধহয় অবান্তর হবে না। প্রশ্নটি হোল, সুরেন্দ্রনাথের অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে শাস্তিটা কি সত্যিই খুব কঠিন হয়েছিল? অথবা,

CENTRAL LIBRARY

আই. সি. এস পদ থেকে বহিষ্কার করা ছাড়া অন্য কোন শাস্তি কি সুরেন্দ্রনাথকে দেওয়া যেত না ?

ভাইসরয় লর্ড নর্থব্রুকের ব্যক্তিগত ইচ্ছে ছিল না সুরেন্দ্রনাথকে পদচ্যুত করার। সুরেন্দ্রনাথকে পদচ্যুত করার সুপারিশ সহ সরকারী চিঠির সংগে সংগেই ভারত সচিব ডিউক অফ্ আরগাইলকে লিখিত ব্যক্তিগত পত্রে তিনি লিখেছিলেন, **'you will receive by this mail our opinions upon the conduct of Mr. Banerjea, one of the Native Civil Servants. My desire was, if possible, to come to the conclusion that he might be retained in the service, but the case was bad.'**১৬ সুরেন্দ্রনাথকে চাকরীতে বহাল রাখাই যদি লর্ড নর্থব্রুকের ব্যক্তিগত ইচ্ছে থাকবে, তবে এত কঠিন শাস্তির জন্য তিনি সরকারী পর্যায়ে সুপারিশ করলেন কেন ? এক কথায় উত্তর দেওয়া যায়, এ ছাড়া উপায় ছিল না ; কারণ, সুরেন্দ্রনাথের কেসের মাত্র ক' বছর পুর্ব্বে এবং প্রায় একই সময়ে অনুরূপক্ষেত্রে একই ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছিল।

কার্যে গাফিলতি এবং অন্যান্য নানা অপরাধে ইতিপুর্ব্বে বহু ইউরোপীয় আই. সি. এস অফিসারকে চাকরী থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে হয়ত এর মধ্যে অনেকেরই অপরাধের মাত্রা ছিল সুরেন্দ্রনাথের চাইতে কম। সুরেন্দ্রনাথের সমসাময়িককালে তিনজন ইউরোপীয় আই. সি. এস অফিসারকে পদচ্যুত করা হয়েছিল। এঁরা হলেন,—রাজশাহীর জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর, পি. এ. হামফ্রে, সিসরা জেলার অস্থায়ী ডেপুটি কমিশনার বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, আর. জি. মেলভিল এবং এইচ. বি. ব্রেডবিউরী নামে অপর একজন আই. সি. এস অফিসার। সুতরাং যে ক্ষেত্রে সমঅপরাধে বা অপেক্ষাকৃত কম অপরাধে ইউরোপীয় অফিসারদের বহিষ্কার করা হয়েছিল, সেক্ষেত্রে একজন ভারতীয় অফিসারকে দাক্ষিণ্য প্রদর্শনের সুযোগ ছিল না।

এখন বিশ্লেষণ করে দেখা যাক্ সমসাময়িককালে বহিষ্কৃত ইউরোপীয় অফিসারদের অপরাধের প্রকৃতি এবং গুরুত্ব।

প্রথমে নেওয়া যাক্ হামফ্রের কেসটি। ওয়েলস্ রাজশাহী জেলার কালেক্টর। তাঁর অধীনে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন, পি. এ. হামফ্রে। ১৮৬৪ সালে রাজশাহীর কালেক্টর ডিগ্রীর বলে একটি দরপত্তনী বিক্রী করেন এবং

CENTRAL LIBRARY

বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে ডিক্রীদারদের বকেয়া মিটিয়ে অতিরিক্ত অর্থ সহকারী তহবিল বা জেলা ট্রেজারীতে জমা রাখেন। এই অতিরিক্ত অর্থের প্রাপক ছিলেন ময়মুন্নিসা বেগম এবং মুসাদবিবি নামে দুই ভদ্র মহিলা। এই অর্থ এঁদের দেওয়া গেল না, কারণ, যেমাত্র দরপত্তনী বিক্রী হয়েছিল, সেমাত্রই লক্ষণ সিং দুগার নামে এক জমিদার এ দুই ভদ্র মহিলার বিরুদ্ধে রাজশাহীর প্রিন্সিপ্যাল সদর আমীন এবং সদর আমীনের আদালতে দু'টি মামলা ঠুকে দেন। এ দুই আদালত আদেশ জারি করলেন, ঐ অর্থ ক্রোক করে রাখার জন্য। যাহোক, ১৮৬৬ সালের শেষাশেষি প্রিন্সিপ্যাল সদর আমীন তাঁর আদালতের মামলাটি খারিজ করে দেন। পরের বছরের জানুয়ারী মাসে এ দুই ভদ্র মহিলা কালেক্টরের কাছে আবেদন করলেন, যেহেতু তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত মামলার একটি মামলা প্রিন্সিপ্যাল সদর আমীন খারিজ করে দিয়েছেন, সেহেতু ঐ অর্থ ক্রোক করে রাখার আর কোন প্রয়োজন নেই, এবং কালেক্টর সাহেব যেন তাঁদের প্রাপ্য অর্থ তাঁদের দিয়ে দেন।

ঠিক এ সময়েই কালেক্টর ওয়েলস্ সাহেব সদর শহর রাজশাহী ত্যাগ করে মফঃস্বল পরিভ্রমণে বের হ'ল। তাঁর অনুপস্থিতে অস্থায়ীভাবে কাজ করতে আসেন হামফ্রে। হামফ্রে কার্যভার গ্রহণ করেই ১৮৬৭-র ২রা ফেব্রুয়ারী ঐ ক্রোক করা অর্থ ময়মুন্নিসা বেগম এবং মুসাদবিবিকে দিয়ে দেন। আপাত দৃষ্টিতে এই অর্থ প্রদান অসংগত না দেখালেও আইনের বিচারে এটা ছিল অপরাধ। প্রিন্সিপ্যাল সদর আমীনের আদালতে ঐ দুই মহিলার বিরুদ্ধে আনীত মামলা খারিজ হয়ে গেলেও আদালত কিন্তু তখন পর্যন্ত ক্রোক করা অর্থ প্রদান করার কোন আদেশ দেয়নি। সুতরাং লক্ষণ সিংদুগার প্রিন্সিপ্যাল সদর আমীনের কাছে অস্থায়ী কালেক্টর হামফ্রের এই বেআইনী কাজের প্রতিবাদ জানালেন। প্রিন্সিপ্যাল সদর আমীন হামফ্রেকে জবাবদিহি করতে বল্‌লে ২৮শে ফেব্রুয়ারী হামফ্রে উত্তর দিলেন, তিনি মনে করেন, মামলা খারিজ হয়ে যাবার পর ঐ অর্থ প্রদানে কোন বাধা থাকে না। লক্ষণ সিং দুগার তখন উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে হামফ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে বঙ্গীয় সরকার সেই ১৮৫০ সালের ৩৭ নং আইন অনুযায়ী ওই অভিযোগ বিচার করার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করলেন, ঠিক যেভাবে সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি বিচারের জন্য কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল।

CENTRAL LIBRARY

হামফ্রের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র একটি অভিযোগই বিচার হয়েছিল। অভিযোগটি হোল, হামফ্রে ইচ্ছাপূর্বক আদালতের আদেশ অমান্য করেছেন। কমিশনের সামনে হামফ্রে সব দোষ চাপিয়ে দিলেন তাঁর সেরেস্তাদার রামকুমার রায়ের কাঁধে। তিনি বলছেন, ঐ অর্থ প্রদান করার পুর্বে তিনি তাঁর সেরেস্তাদারকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, অর্থ প্রদানের কোন আদেশ আদালত থেকে এসেছে কিনা। উত্তরে সেরেস্তাদার বলেন, এসেছে। সুতরাং সেরেস্তাদারের ভুল সংবাদ পরিবেশনের উপর নির্ভর করেই তিনি ঐ অর্থ প্রদান করেন। কিন্তু সেরেস্তাদার তাঁর এজাহারে বললেন, সাহেব তাঁকে ঠিক ঐ কথা জিজ্ঞেস করেন নি। তিনি শুধু জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কোর্ট থেকে কোন অর্ডার এসেছে কিনা।' উত্তরে তিনি বলেন, 'এসেছে'। কোর্ট থেকে ত' অর্ডার সত্যিই এসেছিল, কিন্তু সেটা ক্রোক করে রাখা অর্থ প্রদানের নয়, মামলা খারিজের। সুতরাং সেরেস্তাদারের বক্তব্য, তিনি কোন ভুল সংবাদ সাহেবকে দেননি। হামফ্রের নিজের পক্ষের জামরাৎ আলী নামে এক সাক্ষীও সেরেস্তাদার রামকুমার রায়ের বক্তব্যকেই সমর্থন করেন।

অর্থাৎ, মূল বিষয়টি দাঁড়াল একটি বাক্যাংশের যোগ বিয়োগের উপর। একদিকে হামফ্রে বলছেন, তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, আদালত থেকে অর্থ প্রদানের কোন আদেশ এসেছে কিনা ; অন্যদিকে সেরেস্তারের বক্তব্য, অর্থ প্রদানের কথাটি সাহেব ব্যবহার না করে সাহেব শুধু জিজ্ঞেস করেছিলেন, আদালত থেকে কোন আদেশ এসেছে কিনা।

হামফ্রে ছিলেন বৃটিশ কভেন্যান্টেড অফিসার এবং পদমর্য্যাদায় জয়েন্ট ম্যাজিষ্টেট। কমিশন কিন্তু হামফ্রের বক্তব্যের চাইতেও বেশী বিশ্বাসযোগ্য মনে করলেন, একজন সামান্য নেটিভ কর্মচারী সেরেস্তাদার রামকুমার রায়ের বক্তব্য। তাঁরা হামফ্রের পদমর্য্যাদার দ্বারা প্রভাবান্বিত হননি। তাঁদের মতে সেরেস্তাদার যদি হামফ্রেকে ভুল পথেই চালিত করে থাকবে, তবে ঐ অর্থপ্রদান করার পর প্রিন্সিপ্যাল সদর আমীন যখন তাঁকে জবাবদিহি করতে বলেছিলেন, তখন কেন তিনি ২রা ফেব্রুয়ারী নিজের কৃতকর্মের সমর্থনে বলেছিলেন, মামলা খারিজ হয়ে যাবার পর অর্থ প্রদান না করার পশ্চাতে তিনি কারণ খুঁজে পাননি। এখানেই হামফ্রে নিজের জালে নিজে ধরা পড়েন।

CENTRAL LIBRARY

শেষ পর্যন্ত হামফ্রে যখন দেখলেন, আর পরিত্রাণ পাবার উপায় নেই, তখন কমিশনের কাছে পাল্টা অভিযোগ করলেন তাঁর বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র হয়েছে. এবং তাঁকে অপদস্থ করার এই প্রচেষ্টাটি পূর্ব পরিকল্পিত। কমিশন কিন্তু ষড়যন্ত্রের কোন প্রমাণও পাননি এবং এসব অভিযোগের কোন গুরুত্বও দেননি। তবুও কমিশন সবদিক বিবেচনা করে হামফ্রেকে দোষী সাব্যস্ত করলেন না এবং এই ত্রুটিটাকে একটি মারাত্মক ত্রুটি বলেও মনে করলেন না।১৭

কিন্তু বঙ্গীয় সরকার কমিশনের এই রায় গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। সরকার মনে করলেন, নিজের দোষ ঢাকার জন্য বারবার সেরেস্তাদার রামকুমার রায়ের উপর মিথ্যে দোষারোপ করার প্রচেষ্টাই ঘোরতর অপরাধ। এই 'wilfully untrue statement' যিনি করতে পারেন, তিনি সরকারী চাকুরীর অনুপযুক্ত। সুতরাং কমিশনের রায়ের সংগে ভিন্নমত পোষণ করে বঙ্গীয় সরকার ভারত সরকারকে অনুরোধ করলেন, হামফ্রেকে বরখাস্ত করতে।১৮ ভারত সরকারও বঙ্গীয় সরকারের সংগে সম্পূর্ণ একমত হয়ে ভারত সচিবকে লিখলেন, তিনি যেন হামফ্রেকে সসম্মানে পদত্যাগের নির্দেশ দেন।১৯ হামফ্রে পদত্যাগের বিনিময়ে কয়েকটি সর্ত আরোপ করতে চাইলে শেষ পর্যন্ত তাঁকে পদচ্যুতই করা হয়।২০ হামফ্রে সুরেন্দ্রনাথের মতই ভারত সচিবের কাছে ব্যক্তিগত আবেদন করেছিলেন, কিন্তু বলাবাহুল্য তাতে কোন ফল হয়নি।

হামফ্রে এবং সুরেন্দ্রনাথের আচরণের একটি বিষয় বঙ্গীয় সরকার এবং ভারত সরকার উভয়েই বরদাস্ত করতে পারেননি। কোন সময়েই এঁরা দুজন নিজেদের ত্রুটি স্বীকার করেননি, এবং সর্বদাই দায়ী করেছেন অধস্তন কর্মচারীদের। হামফ্রে দায়ী করেছিলেন তাঁর সেরেস্তাদার রামকুমার রায়কে এবং সুরেন্দ্রনাথ দোষ চাপিয়েছিলেন তাঁর মুহুরী দুর্গাচরণ দেবের কাঁধে। আই, সি, এস পদমর্য্যাদার অফিসারদের পক্ষে এই আচরণ সরকারের কাছে ছিল অতীব নিন্দার্হ। বৃটিশ সরকার এ ধরণের ক্ষত্রে জাতিগত বৈষম্যের শিকার হননি এবং বৃটিশ আই, সি, এস অফিসাররা সীজারের পত্নী এ ধারণাও তাঁরা পোষণ করেননি।

সরকারী ভাষ্য অনুযায়ী হামফ্রের পদচ্যুতির সংগে সুরেন্দ্রনাথের পদচ্যুতির প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল। ভারত সচিবকে ভারত সরকার স্পষ্টই লিখেছিলেন, যে সামান্য অপরাধে হামফ্রেকে সিবিল সার্ভিস থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল,

CENTRAL LIBRARY

সুরেন্দ্রনাথের অপরাধ তার চেয়ে অনেক বেশী গুরুতর, সুতরাং সুরেন্দ্রনাথের পদচ্যুতির সুপারিশ ছাড়া অন্য কোন সুপারিশ তাঁরা করতে পারছেন না।২২

সরকারী চিঠি পত্রাদিতে সুরেন্দ্রনাথের পদচ্যুতির জন্য যদিও বা সরকার শুধুমাত্র হামফ্রের দৃষ্টান্তই দিয়েছিলেন, তবুও আর একজন কভেন্যাণ্টেড সিবিল সার্ভেণ্টের পদচ্যুতির ঘটনাও এর সংগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল বলেই মনে হয়। সরকারী চিঠিতে এ দুটো ঘটনার মধ্যে সংযোগ সৃষ্টির প্রমাণ না থাকলেও যে চিঠিতে(২৩) লর্ড নর্থব্রুক সুরেন্দ্রনাথকে চাকরীতে বহাল রাখার নিজস্ব ব্যক্তিগত ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন, সে চিঠিতেই মেলভিল নামে আর একজন কভেন্যাণ্টেড সিবিল সার্ভেণ্টের পদচ্যুতির উল্লেখ আছে। সুরেন্দ্রনাথের পদচ্যুতির সুপারিশ করা হয়েছিল ১৮৭৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। এ ঘটনার মাত্র কয়েকদিন পুর্ব্বে ঠিক একই সুপারিশ ভারত সরকার পাঠিয়েছিলেন মেলভিল সম্পর্কে। সুতরাং মেলভিলের পদচ্যুতিও নিশ্চয়ই সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে ঐ ধরণের কঠোর ব্যবস্থা নিতে সরকারকে প্রভাবান্বিত করেছিল।

এখন মেলভিলের কেসটি সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। মেলভিলের পুরো নাম রিচার্ড গোয়াটকীন মেলভিল। হামফ্রে ও সুরেন্দ্রনাথের মত ইনিও ছিলেন বেঙ্গল প্রেসীডেন্সীর সংগে যুক্ত কভেন্যাণ্টেড সিবিল সার্ভেণ্ট বা তখনকার বয়ানে বেঙ্গল সিবিল সার্ভেণ্ট।২৪ যখন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা হয়েছিল, তখন তিনি ছিলেন পাঞ্জাবের সিসরা জেলার অস্থায়ী ডেপুটি কমিশনার বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। যদিও বা তিনি বিবাহিত ছিলেন, কিন্তু স্ত্রী পুত্রকন্যা বাস করতেন স্বদেশে বা গ্রেটব্রটেনে। হঠাৎ ১৮৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সরকারের খাস মহলে সংবাদ এসে পৌঁছিল মেলভিল একটি অবিশ্বাস্য কাজ করে বসেছেন। তিনি সিসরা শহরের বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মুস্পামুৎ হায়দারী বেগমের নবম বর্ষীয়া কন্যা মুস্পুমুৎ কোরেসী বেগমের পাণি গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হননি, নিজের ধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে নূতন নাম নিয়েছেন, শেখ আবদুল রহমান। এতেও হয়ত অত অপরাধ ছিল না, কিন্তু তিনি নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করে পূর্ব্বের স্ত্রীকে পরিত্যাগ না করে, নবপরিণীতা "শিশুপত্নী" এবং শিশুপত্নীর মাতা, অর্থাৎ শাশুড়ীর সংগে একই গৃহের একই কক্ষে রাত্রি যাপন শুরু করেছেন।

খৃষ্টধর্ম্ম অনুসারে এক স্ত্রীর বর্তমানে বিবাহ বিচ্ছেদ ছাড়া (ক্যাথলিক ধর্ম্মে

CENTRAL LIBRARY

তাও অনুমোদিত নয়) অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা যায় না। সেই নিয়মকে বৃদ্ধাংগুষ্ঠ দেখাবার জন্যই মেলভিল ধর্ম্ম পরিবর্তন করেছিলেন, কিন্তু ব্যাপারটি সত্যিই কলংকজনক। সরকার সামান্য অনুসন্ধান করেই জানতে পারলেন (বিশেষতঃ সিসরা জেলার অন্যান্য বৃটিশ রাজকর্ম্মচারীরা জানালেন), মেলভিল যদিও পাণি গ্রহণ করেছেন নবম বর্ষীয়া কোরেসী বেগমের, কিন্তু তাঁর মূল লক্ষ্য তাঁর শাশুড়ী, হায়দারী বেগম। হায়দারী বেগমের বয়স তখন "প্রায় ত্রিশ" গায়ের রং খুবই ফর্সা', 'তখনও অটুট যৌবনের অধিকারিণী'। তাঁর স্বামী ছিলেন কর্নেল ডগসনের খানসামা, নাম—পীরবক্স, ওরফে মুরাদ আলী। এ ঘটনার পূর্ব্বেই তিনি তাঁর স্বামীর সংগে বিবাহ বিচ্ছেদ করেছেন এবং তাঁর সংগে জেলার ডেপুটি কমিশনার মেলভিল সাহেবের একটি রহস্যজনক সম্পর্ক বেশ কিছুদিন ধরেই নাকী চলে আসছিল।

যাহোক, সরকার কিন্তু পড়ে গেলেন মহাফ্যাসাদে। যদি এ বিষয়ে ব্যাপক অনুসন্ধানের জন্য কোন উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কমিশন নিয়োগ করা হয়, তবে জেলার মুসলমান অধিবাসীরা মনে করতে পারে, যেহেতু মেলভিল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন, সেহেতুই এ কমিশনের নিয়োগ; অর্থাৎ সরকার চান না কোন বৃটিশ রাজকর্মচারী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করুক। অথচ এ ধরণের কোন গুরুতর অভিযোগ সম্বন্ধে জ্ঞাত হবার পরেও সরকারের পক্ষে চুপ করে বসে থাকা অসম্ভব। তাই সরকার প্রথমে সরকারী পর্য্যায়ে বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করলেন।

মেলভিল তাঁর সংগে নবম বর্ষীয়া কোরেসী বেগমের বিবাহের সংবাদের সত্যতা স্বীকার করলেন; কিন্তু তাঁর সংগে তাঁর শাশুড়ীর কোন অবৈধ সম্পর্ক ছিল বা আছে, এ অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন। তাঁর বক্তব্য অনুসারে, তিনি বালিকা কোরেসী বেগমের বুদ্ধিমত্তা এবং আচার আচরণের তৎপরতায় মুগ্ধ হয়েই তাকে বিবাহ করেছেন এবং এটা এতই ব্যক্তিগত ব্যাপার যে তিনি মনে করেন না '...it is an official matter', তবুও যদি সরকার এ ব্যাপারে আরো অগ্রসর হ'ন, তাই জানালেন, 'I would give up the service rather than yeild to any official order'.২৫ মেলভিল যখন বারবার ব্যাপারটিকে ব্যক্তিগত ব্যাপার ছাড়া অন্য কোন কিছু নয় বলে জেদাজেদি করলেন, তখন সরকার বাধ্য হয়ে আধা সরকারী বা demi official তদন্ত কমিশন বসালেন। এ কমিশনের

CENTRAL LIBRARY

দায়িত্ব দেওয়া হোল দিল্লি ডিভিশনের কমিশনার কর্নেল জে. ই. ক্র্যাক্রফ্‌টের উপর।

যদিও নামে বলা হোল আধা সরকারী তদন্ত, ক্র্যাকরফ্‌ট কিন্তু প্রকাশ্যেই তদন্তকার্য্য চালালেন। তাঁর কাছে দেওয়া বহু সাক্ষ্যেই প্রকাশ পেল, বেশ কিছুদিন ধরেই স্থানীয় সব ধরণের অধিবাসীরাই সন্দেহ করে আসছিল, মেলভিলের সংগে তাঁর বালিকা পত্নীর মাতা, হায়দারী বেগমের একটি অবৈধ সম্পর্ক চলে আসছে। সরকারী কাজকর্ম্ম ছাড়াও দিনের অন্তিমলগ্নে মেলভিলের নির্জন আবাসের শয়নকক্ষে হায়দারী বেগমের প্রবেশ এবং রুদ্ধদ্বার কক্ষে মেলভিলের সংগে অনেক সময় কাটানো বহু লোকেরই দৃষ্টি এড়ায়নি। প্রথমে কানাঘুষা এবং পরে এই ব্যাপারটিকে ঘিরে প্রকাশ্যেই আলোচনা শুরু হয়। মেলভিলের শুভানুধ্যায়ী কয়েকজন বৃটিশ রাজকর্মচারী তাঁকে সাবধান হতে বল্লেও মেলভিল শোনেননি। আস্তে আস্তে ব্যাপারটি যখন স্ক্যাণ্ডালের পর্য্যায়ে পৌঁছায়, তখনই ব্যাপারটি অন্যদিকে মোড় ঘোরাবার জন্য, অথবা বলা যেতে পারে, নিজের মুখ রক্ষার তাগিদে তিনি হায়দারী বেগমের কন্যাকে বিবাহ করেন।

কমিশন কিন্তু মেলভিলের সংগে তাঁর শাশুড়ী, হায়দারী বেগমের অবৈধ যৌন সম্পর্কের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাননি; শুধুমাত্র মেলভিল, তাঁর শিশুপত্নী এবং তাঁর শাশুড়ীর একই কক্ষে রাত্রি যাপন ছাড়া। এ বিষয়ে মেলভিলের উত্তর ছিল, ভারতীয় রীতিতে স্বামী স্ত্রী এবং শাশুড়ীর একই কক্ষে রাত্রি যাপন খুব অস্বাভাবিক নয়। যাহোক, কমিশন সরাসরি মেলভিলকে অপরাধীও সাব্যস্ত করেননি। আবার মেলভিলের সংগে তাঁর শাশুড়ীর কোন অবৈধ সম্পর্কের অস্তিত্বের সম্ভবনাকেও একেবারে অমূলক বলে মনে করেননি। কিন্তু পাঞ্জাবের সরকারী কৌসুলী, এইচ. এস. প্রাউডেনের মতে মেলভিল ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৪ ধারা অপরাধী বলেই বিবেচিত হ'ন। মেলভিলকে জড়িয়ে যে ধরণের স্ক্যাণ্ডাল হয়েছে তাতে সরকার সিদ্ধান্তে এলেন, মেলভিল কভেন্যাণ্টেড সিবিল সার্ভেণ্ট পদমর্যাদার অনুপযুক্ত। সপর্ষদ লর্ড নর্থব্রুক ভারত সচিব লর্ড আরগাইলকে লিখলেন, '...proofs which his [Melvill's] conduct has thus afforded of his unworthiness as an officer, of his open disregard for public decency, and his incapacity to appreciate the ordinary standard of right

CENTRAL LIBRARY

and wrong, compel us to determine that he is no longer fit for employment in the public service...Mr. R. G. Melvile be removed from the Covenanted Civil Service'.২৬ স্থির করা হোল, ইংলণ্ডে মেলভিলের খৃষ্টমতে বিবাহিত স্ত্রী পেন্সন পাবেন বাৎসরিক ১৫০ পাউণ্ড এবং মেলভিলের সন্তানরা পাবেন প্রত্যেকে বাৎসরিক ৫০ পাউণ্ড। মেলভিল নিজে কোন পেন্সন পাবেন না।২৭

মেলভিলের পদচ্যুতির কেসটি থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে বৃটিশ সরকার সরকারী চাকরীর শ্লীলতা রক্ষায় কতটা যত্নশীল ছিলেন। কমিশনের সামনে প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ ছিল না। এজন্যই কমিশন মেলভিলকে সরাসরি দোষী সাব্যস্ত করেননি। কিন্তু যেহেতু একটি অশ্লীল রটনা মেলভিলের বিরুদ্ধে উঠেছিল, এবং এ রটনার পশ্চাতে সত্যতার সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়েও দেওয়া যায় না, তাই একজন বৃটিশ সিবিল সার্ভেণ্টকে পদচ্যুত করতে সরকার দ্বিধা করেননি।

ঐ বছরই অর্থাৎ ১৮৭৪ সালে এইচ. বি. ব্র্যাডবিউরী নামে অপর আর একজন কভেন্যাণ্টেড সিবিল সার্ভেণ্টেকেও বহিষ্কার করা হয়। ইনিও হামফ্রে, মেলভিল এবং সুরেন্দ্রনাথের মত বেঙ্গল প্রেসীডেন্সীর সংগে যুক্ত ছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় সরকারী নিয়ম অনুসারে এঁর কেসটির নথীপত্রটি 'খ' শ্রেণীভুক্ত করে নষ্ট করে ফেলার জন্য এর সম্বন্ধে বিশদ তথ্য সংগ্রহ করা অতীব কষ্টকর।২৮

৩

বহু বছর ধরে আমাদের মনে একটি বদ্ধমূল ধারণা হয়ে আছে, জাতিগত বৈষম্যের বশবর্ত্তী হয়েই তৎকালীন বৃটিশ সরকার সুরেন্দ্রনাথকে সিবিল সার্ভিস থেকে বহিষ্কৃত করেছিলেন। আমরা জেনে এসেছি, ভারতীয়রা সিবিল সার্ভিসে প্রবেশ করুক, বৃটিশ সরকার এটা চাইতেন না। সুরেন্দ্রনাথের সাফল্যের জন্য তাঁকে সিবিল সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত করতে সরকার অনিচ্ছায় বাধ্য হয়েছিলেন। সরকার সর্ব্বদাই চেষ্টা করতেন, কি করে সামান্য অজুহাতে ভারতীয়দের এই 'স্বর্গীয় চাকরী' থেকে বহিষ্কার করা যায়। তাই, যে মাত্র সুযোগ এল, সেমাত্রই 'অতি নগণ্য করণিক ত্রুটির জন্য' সুরেন্দ্রনাথকে পদচ্যুত করেছিলেন। অর্থাৎ সরকার উৎগ্রীব হয়েই ছিলেন, তাই প্রথম সুযোগেই সুরেন্দ্রনাথকে সরিয়ে সরকার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। এ জন্য দায়ী সুরেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী, A]

CENTRAL LIBRARY

Nation in Making. কিন্তু আমরা ভুলে যাই, তৎকালীন বৃটিশ সরকারের অধীনে সুরেন্দ্রনাথই শুধুমাত্র একজন ভারতীয় আই. সি. এস ছিলেন না। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত, শ্রীপদ বাবাজী ঠাকুর ইত্যাদিরা আরো বহু বছর ঐ পদে বহাল ছিলেন। রমেশচন্দ্র হয়েছিলেন অস্থায়ী বিভাগীয় কমিশনার এবং বিহারীলাল **Remembrancer of Legal affairs** ও হাইকোর্টের অস্থায়ী বিচারকের পদও অলংকৃত করেছিলেন। যদিও রমেশচন্দ্রের মনে অভিমান ছিল, যে তার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাকে বিভাগীয় কমিশনার পদে স্থায়ী করা হয়নি বা কোন সেক্রেটারীর পদে উন্নীত করা হয়নি (২৯) তবে তাঁকে বহিষ্কার করে সরকার নিষ্কৃতি পেতে চান, এ অভিযোগ তিনি কোথাও করেননি, বা এ ধরণের কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না। এ কথাও ঐতিহাসিক সত্য যে ইলবার্ট বিলের ভিত্তি ছিলেন বিহারীলাল।৩০ সরকারী নীতি যদি জাতিগত বৈষম্যের দ্বারাই পরিচালিত হোত, তবে বিহারীলালের মন্তব্যের ফলস্বরূপ ইলবার্ট বিলের উৎপত্তি হোত কি করে?

মোদ্দা কথা হোল, বৃটিশ শাসনের মান ছিল খুবই চড়া সুরে বাঁধা। কর্ণওয়ালিসের কাল থেকেই এটাই সরকারী নীতি হিসেবে স্বীকৃত হয়ে এসেছে, কভেন্যান্টেড সিবিল সার্ভেন্টেদের যোগ্যতার মান হবে খুবই উঁচু। কর্ণওয়ালিস যে ভারতীয়দের উচ্চ সরকারী চাকুরীতে প্রবেশের পথ রুদ্ধ করেছিলেন, তার প্রধান কারণ ছিল, তিনি ভারতীয়দের সততায় বিশ্বাসী ছিলেন না।৩১ এই মান বজায় রাখার জন্যই ম্যাকলে পৃষ্ঠপোষকতার বদলে প্রতিযোগীতার মাধ্যমে সিবিল সার্ভিসে ভর্তির জন্য অত সুপারিশ করেছিলেন এবং ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিযোগীতার নীতিই স্বীকৃত হয়। এই মান বজায় রাখার জন্য সরকার কতটা যত্নশীল ছিলেন, তার ভুরিভুরি প্রমাণ রয়েছে গত শতাব্দীর সরকারী নথিপত্রে। এই মান নিম্নগামী হচ্ছে বলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে তৎকালীন ভাইসরয়রা বিলেতের কর্তৃপক্ষের কাছে অনুযোগ করেছেন।৩২ কোন রকম কর্তব্য অবহেলা, কার্যে গাফিলতি, দীর্ঘসূত্রতা, চারিত্রিক পদস্খলন ইত্যাদি কোন বিচ্যুতির কোন প্রশ্রয় বৃটিশ শাসনে ছিল না।

সুতরাং বৃটিশ শাসনের উচ্চতম সরকারী কর্মচারী বা সিভিল সার্ভিসের যোগ্যতার পর্য্যায় এতই উঁচু বলে ধরা হোত যে সামান্য অপরাধেই হামফ্রের চাকরী

CENTRAL LIBRARY

গিয়েছিল। সরকার ইচ্ছে করলে মেলভিলের ব্যাপারটিতে চোখ বুজে থাকতে পারতেন। কিন্তু তা' করা হয়নি। এঁদের দণ্ড দেবার পর সুরেন্দ্রনাথের জন্য অন্য মাপকাঠি প্রয়োগ করার উপায় ছিল না। সে সময় অতি স্বল্পসংখ্যক ভারতীয়ই কভেন্যাণ্টেড সিবিল সার্ভিসে ছিলেন, সুতরাং সরকারী নীতি যদি এভাবে ঠিক হোত যে ঐ স্বল্প-সংখ্যক ভারতীয়দের মধ্যে অপরাধ প্রমাণিত হওয়া সত্বেও একজনকে বহিষ্কার করা উচিত হবে না, তাহলে বৃটিশ সরকার জাতিগত বৈষম্যকে অন্যরূপে প্রদর্শন করতেন। সেক্ষেত্রে ব্যাপারটি দাঁড়াত, বৃটিশ সিবিল সার্ভিন্টদের জন্য সামান্য অপরাধেও মার্জ্জনা নেই, কিন্তু ভারতীয়দের জন্য সরকার মহা অপরাধে অপরাধীকেও প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত। বৃটিশ সরকার এই ডবল ষ্ট্যানডার্ড বা দুই ধরণের মাপকাঠি—ভারতীয়দের জন্য এক, অথচ ইউরোপীয়দের জন্য আলাদা—প্রয়োগ করতে চাননি। বঙ্গীয় সরকার এ বিষয়ে স্পষ্টই লিখেছিলেন—'If we are to have natives of India in the Covenanted Service...they must be judged by the same high standard of honor and morality laid down for the European members of that service. Nothing could be more disastrous for the Govt of India, and nothing worse for the native civilians themselves, than to show leniency to gross and persistent dereliction from truth and honesty in work and conduct.'[৩৩]

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কর্ণওয়ালিস কোড প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বেও যেমন (৩৪) ঐ বছরের পরবর্ত্তী একশ' বছরে কর্ত্তব্যে অবহেলা বা আরো নানাধরণের ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য কভেন্যাণ্টেড অফিসারের পদচ্যুতির বহু দৃষ্টান্ত সরকারী নথিপত্রে ছড়িয়ে আছে। আর, আনকভেন্যাণ্টেড অফিসারদের! এঁদের চাকরী গিয়েছে বাংলা ভাষা না শেখার জন্য, একজন উর্ধতন অফিসারের সংগে ব্যক্তিগত পত্রবিনিময় হয়, এ ধরণের একটি মিথ্যে কথা বলার জন্য, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সরকারী কাজ শেষ না করার জন্য, আফিং সেবনের জন্য ইত্যাদি আরো অনেক কারণে।[৩৫]

মাসীর যদি গোঁফ জন্মাত তবে তিনি মেসো হতেন, এ ধরণের ইতিহাস ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। তবুও বলছি, সুরেন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালে যদি হামফ্রে এবং মেলভিলের কঠিন দণ্ডপ্রাপ্তি না হোত তবে হয়ত সুরেন্দ্রনাথকে সরকার অতটা কঠিন শাস্তি দিতেন না। তবে জাতিগত বৈষম্যের ভিত্তিতে সুরেন্দ্রনাথকে পদচ্যুত

CENTRAL LIBRARY

করা হয়েছিল তা' স্বীকার করা যায় না। সুতরাং সুরেন্দ্রনাথের কেসটি যে জাতিগত বৈষম্যের দৃষ্টিতে বিচার করা উচিত নয়, তা নির্দ্দেশ করার জন্যই হামফ্রে এবং মেলভিলের কেস দুটির অবতারণা করতে হোল, এবং বলা ভাল, তাঁর চাকরী গিয়েছিল কর্ত্তব্যে অবহেলার জন্যই।

সূত্র নির্দেশ

১। রমেশ চন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীপদ বাবাজী ঠাকুর।

২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—রমেশ চন্দ্র দত্ত। পুস্তক নং ৬৫, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, জ্যৈষ্ঠ-১৩৬৮, (২য় সংস্করণ), পৃঃ ৯ [যুক্ত সংস্করণের ৫ম খণ্ড]।

৩। ঐ, পৃষ্ঠা, ১১।

৪। ভারত সরকারকে লেখা বঙ্গীয় সরকারের অস্থায়ী অতিরিক্ত সচিব, এ. ম্যাকেঞ্জীর ১৮৭৩ সালের ১০ই ডিসেম্বরের চিঠি। Govt. of India, Home (Public) Proceedings, No : 209. of May 1874.

৫। Report of the Commission, dated 5 Dec., 1873, Govt. of India Home (Public) Proceedings, No 209 A of May 1874.

৬। ঐ।

৭। এ, ম্যাকেঞ্জীর ১৮৭৩ সালের ১০ই ডিসেম্বরের চিঠি, পূর্ব্বে উল্লেখিত।

৮। নিখিল সুর, 'আই,সি,এস সুরেন্দ্রনাথ', ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সংকলন, সম্পাদিত), কলিকাতা এপ্রিল, ১৯৭৮, পৃঃ ৩৮

৯। ঐ, পৃঃ ৩৯।

১০। এ, ম্যাকেঞ্জীর চিঠি, তাং ১০।১২।১৮৭৩, পূর্ব্বে উল্লেখিত।

১১। ভারত সচিবকে লেখা, সপর্ষৎ ভাইসরয় লর্ড নর্থব্রুকের চিঠি। ১৮৭৪

সালের ৯ নং চিঠি, তাং ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৪, Govt. of India, Home (Public) Proceedings, No : 210 of May, 1874.

১২। ভারত সচিব লর্ড স্যালসবেরীকে নিবেদিত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর ১৮৭৪ সালের ২৭শে এপ্রিলের আবেদন। Govt. of India, Home (Public) Proceedings, No : 79 and 80 A of July, 1874.

১৩। ঐ, নর্থব্রুকের মন্তব্য, তাং ২৬শে জুন, ১৮৭৪, এবং হবহাউসের মন্তব্য, তাং ২৮শে জুন, ১৮৭৪

১৪। ভারত সচিবের নিকট ভারত সরকারের পত্র, নং ৪০, তাং ১৪ই জুলাই, ১৮৭৪, Govt. of India, Home (Establishment) Proceedings, No : 80 of July, 1874.

১৫। ভারত সরকারকে লিখিত ভারত সচিবের পত্র। নং ৪৭, তাং ১৮৭৪ সালের ৩১শে মার্চ্চ, vt. of India, Home (Public) Proceedings, No : 211 of May, 1874.

১৬। Duke of Argyllকে লিখিত লর্ড নর্থব্রুকের ব্যক্তিগত পত্র, তাং ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৪। Microfilms of the Private Papers of Lord Northbrook, Letter No : 9, From Lord Northbrook, Roll No : 1, National Archives of India, New Delhi.

১৭। Report of the Commission submitted on 25 Sept., 1870, Govt. of India Home (Public) Consultations, A, No : 130 of 12 Feby., 1870.

১৮। ভারত সরকারের সেক্রেটারী, ই, সি বেইলেকে লেখা বঙ্গীয় সরকারের অস্থায়ী সেক্রেটারী আর, টমসনের চিঠি, নং ৩৭১৩, তাং ২৮শে অক্টোবর, ১৮৬৯ Govt. of India, Home (Public) Consultations, A, No : 129 of 12 Feby., 1870.

১৯। ভারত সচিবকে লিখিত ভারত সরকারের চিঠি, নং ৯৩, তাং ১২ আগষ্ট, ১৮৭০, Govt. of India, Home (Public) Consultations, A, No

২০। ঐ এবং Home (Public) Consultations A, No : 153 of 13 August, 1870.

২১। সহকারী ভারত সচিবের কাছে প্রেরিত হামফ্রের আবেদন, তাং ৩রা মে,

CENTRAL LIBRARY

১৮৭০। Govt. of India, Home (Public) Consultations A, No ; 110 of 2 July, 1870.

২২। ভারত সচিবকে সপর্ষৎ ভাইসরয় লর্ড নর্থব্রুক লিখছেন, '...We are unable to allow that Mr. Banerjea's youth, or the absence of judicions official supervision...can be accepted in palliation of such offences which are of a kind affecting the public service much more materially than the misconduct for which Mr. Humphrey's removal from the Civil Service was recommended in 1870 by the Govt. of India,...and we feel that we have no other course than to recommend to your Grace that Mr. Surendra Nath Banerjea be removed from the Covenanted Civil Service ? Letter No : 9 of 1874, dated, 6 February, 1874, Govt, of India, Home (Public) Proceedings, No : 210 of May, 1874.

২৩। Duke of Argyllকে লিখিত লর্ড নর্থব্রুকের ব্যক্তিগত পত্র, পূর্ব্বে উল্লেখিত।

২৪। যদিও ড: সুর তাঁর নিবন্ধে এবং বর্ত্তমান লেখক'ও কয়েকটি স্থানে সুরেন্দ্রনাথ বা হামফ্রের ক্ষেত্রে 'আই, সি, এস' কথাটা ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তখনও 'আই,সি,এস' নামক পদ প্রচলিত হয়নি। 'আই,সি,এস' পদটির প্রচলন সুরু হয় ১৮৮৬-৮৭ সালে নিযুক্ত এ্যাচিসন কমিশনের সুপারিশ গৃহীত হবার পর। আবার এ্যাচিসন কমিশনও 'আই, সি, এস' বা ইণ্ডিয়ান সিবিল সার্ভিস পদটি ব্যবহার করার জন্য সুপারিশ করেননি, তাঁরা চেয়ে-ছিলেন পদটির বা চাকরীটির নাম হোক, ইম্পিরিয়াল সিবিল সার্ভিস। আজ আই, সি, এস পদবাচ্যে যাঁদের আখ্যায়িত করা হয় তাঁরা পরিচিত ছিলেন কভেন্যাণ্টেড সিবিল সার্ভিস অফ ইণ্ডিয়া নামে ; তবে যিনি যে প্রেসিডেন্সীর সংগে জড়িত থাকতেন, তিনি পরিচিত হতেন সে প্রেসিডেন্সীর সিবিল সার্ভেণ্ট রূপে। যেমন, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর সংগে যুক্ত কভেন্যাণ্টেড সিবিল সার্ভেণ্টকে বলা হোত, বেঙ্গল সিবিল সার্ভেণ্ট ; সেরকম, মাদ্রাজ সিবিল সার্ভেণ্ট এবং বোম্বে সিবিল সার্ভেণ্ট।

CENTRAL LIBRARY

২৫। হিসাব ডিভিশনের অস্থায়ী কমিশনার লেঃ কর্ণেল ম্যাকমোহনকে লেখা মেলভিলের তারিখবিহীন চিঠি. Govt. of India, Home (Public) Proceedings, No : 372 of January, 1874.

২৬। ভারত সচিব ডিউক অব্ আরগাইলকে লেখা সপর্ষৎ লর্ড নর্থব্রুকের চিঠি, তাং ৩০শে জানুয়ারী, ১৮৭৪ Govt of Home (Public) Proceedings, No : 382 of January, 1874.

২৭। মেলভিলের কেসের সব তথ্যই পাওয়া যায় Govt. of India Home (Public) Proceedings, No : 372-382 of January, 1874--এ।

২৮। ড্যাডবিউরী সম্পর্কে সমান্য যা তথ্য পাওয়া যায় তার সূত্র—Govt. of India, Home (Establishment) Proceedings Nos : 27 and 28 of Oct., 1874.

২৯। অগ্রজকে লেখা রমেশ চন্দ্রের ১৮৯৩ সালের ২৪শে অগাষ্টের চিঠি—'I know I am risking something by supporting the Congress Party in one of their proposals, viz. the separation of the Judicial and Executive services. The "Powers that be" will not be pleased with me for this, and they may even go so far as to stop my expected promotion to a *pucca* commissionership giving some false reasous for it....It does not matter very much to me whether during the next three years of my service they keep me as a first grade Collector, which I am or make me a Commissioner...They [the Government] have treated me on the whole fairly, but not with any special favour. The doors of the Secretariat have been kept closed to me, I have not been employed for a day in any special post, and I have seen my juniors appointed as Secretary to the Government, as Senior Secretary to the Board [of Revenue], as Inspector-General of Police, and in other sepecial and highly paid appointments....'ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্য সাধক চরিতমালা পূর্ব্ব উল্লেখিত পৃঃ ১৭-১৮।

CENTRAL LIBRARY

৩০। Buckland, C.E. *Bengal under the Lieutenant Governors*, Vol II, New Delhi, 1976 (2nd Edition) পৃ: ৭৩৮-৯।

৩১। Seton-Karr, W.S. *The Marquess of Cornwallis* (Rulers of India series, edited by W.W.Hunter). Oxford, 1890, পৃ: ১২১ এবং Aspinall, A *Cornwallis in Bengal*, Mancester, 1931. পৃ: ১৬৯ এবং ১৭২।

৩২। Spangenberg Bradford—*British Bureaucracy in India*. New Delhi 1976, পৃ: ১৪-৫৪।

৩৩। ভারত সরকারকে লেখা বঙ্গীয় সরকারের অস্থায়ী সেক্রেটারী এ, ম্যাকেঞ্জীর চিঠি, পুর্ব্বে উল্লেখিত।

৩৪। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের পুর্বে কর্তব্যে অবহেলা এবং অসদুপায়ে অর্থ উপায়ের জন্য জন্য বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর সিবিল এবং মিলিটারী অফিসারদের পদচ্যুতির বিষয়টি নিয়ে বিহারের একজন গবেষক গবেষণাও করছেন। ওঁরই অনুরোধে নামটি প্রকাশ করলাম না।

৩৫। আনকভেন্যান্টেড অফিসার বা ডেপুটি কালেকটর এবং ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটদের পদচ্যুতির অনেক উদাহরণ এবং তাঁদের কেসগুলি বর্তমান লেখকের সংগ্রহে আছে। সেগুলোর পরিমাণ এতই বেশী যে শুধুমাত্র সুত্র উল্লেখের জন্যই বিস্তৃত পরিসর প্রয়োজন, সেকারণে অগ্রসর হবার চাইতে এ বিষয়ে ভবিষ্যতে একটি তথ্য সমৃদ্ধ পৃথক প্রবন্ধ রচনার বাসনা প্রকাশ করাই শ্রেয় বিবেচিত হচ্ছে।

CENTRAL LIBRARY

ছন্দ
সমন্বয়
গড়ে ওঠে
যৌথ
প্রচেষ্টায়

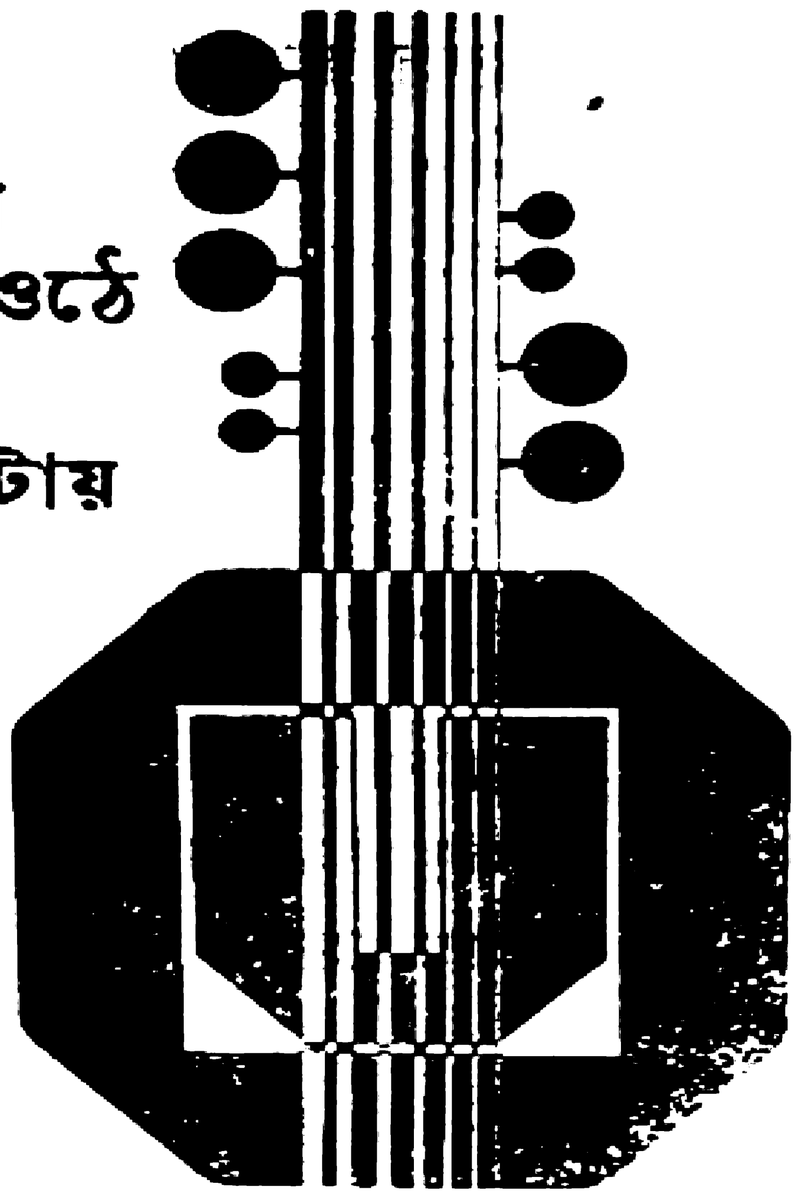

UCOC-180 BN

ইউনাইটেড
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জনগণের স্বাবলম্বী
করে তুলতে সাহায্য করছে

ঐ তি হা সি ক পু স্তি কা মা লা

স্বাধীনতার পর তৃতীয় দশক পার হয়ে গেল। আজও ভারতে ইতিহাস-চর্চার প্রধান ভাষা ইংরেজি। এর ফলে অনেক সময় বিশেষজ্ঞদের চিন্তা ও কাজ তাঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছয় না। সহজ বাংলায় ইতিহাস-গবেষণার ফসল সব রকম পাঠকের হাতে তুলে দেবার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হচ্ছে **ঐতিহাসিক পুস্তিকামালা**।

এতে লিখেছেন :

১ অশীন দাশগুপ্ত : ভারত সাগরের সমুদ্র-বণিক : ১৫০০-১৮০০

২ বিনয় চৌধুরী : ইংরেজ আমলে বাংলাদেশের কৃষক ১৭৫৭ ১৯৪৭

৩ হিতেশ সান্যাল : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার গ্রামাঞ্চলের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ১৯২১-১৯৪৪

৪ সুমিত সরকার : স্বদেশী আন্দোলন : ১৯০৩-১৯০৮

এই পুস্তিকামালায় লিখবেন আরো অনেক বিখ্যাত ঐতিহাসিক।

CENTRAL LIBRARY

কলিকাতার ইতিহাস গ্রন্থমালা

কলকাতার পথঘাট ও পুরোনো বাড়ী, মন্দির মসজিদ গীর্জা ও সমাধিক্ষেত্র আমাদের কৌতূহল জাগায়। শুধু বাড়িঘর নয়, এই শহরের বিশিষ্ট মানুষদের চিন্তাভাবনা ও বিচিত্র কাজকর্ম সম্বন্ধেও আমাদের মনে অনেক প্রশ্ন আছে। অথচ আজও এই বিস্ময়কর শহরের ইতিহাস লেখা হয় নি। কলকাতা বিষয়ে যিনি সবচেয়ে বেশি খবর রাখেন সেই আশ্চর্য লেখক রাধারমণ মিত্রের রচনা দিয়ে শুরু হ'ল ক লি কা তা র ই তি হা স গ্র ন্থ মা লা

১ রাধারমণ মিত্র — গঙ্গার ঘাট
২ শ্রীপান্থ — অন্ধকূপ হত্যা
৩ নিমাই সাধন বসু — ভেতিড হেয়ার

গ্রাহকদের প্রতি

১৯৭৮ এর জন্য যাঁরা বার্ষিক মূল্য ১৫৲ পাঠিয়েছিলেন তাঁরা এই সংখ্যা হাতে পেয়ে পরবর্তী এক বছরের (১৯৭৯) বার্ষিক মূল্য ১৫৲ টাকা পাঠিয়ে দিন।

সম্পাদকমণ্ডলী, ঐতিহাসিক

CENTRAL LIBRARY

Oxford titles on Indian History

RABIN JEFFREY, *ed.*

People, Princes and Paramount Power : *Society and Politics in the Indian Princely States.* *Rs. 80*

A. R. DESAI, *ed.*

Peasant Struggles in India *Rs 140*

RAJAT K. ROY

Industrialization in India : *Growth and Conflict in Private Corporate Sector 1914-47.* *Rs. 80*

MYRON WEINER

Sons of the Soil : *Migration and Ethnic Conflict in India.* *Rs. 150*

B. B. MISRA

The Indian Middle Classes : *Their Growth in Modern Times.* *Rs. 40*

The Indian Political Parties : *An Historical Analysis of Political Behaviour up to 1947.* *Rs. 110*

OXFORD UNIVERSITY PRESS
P-17 Mission Row Extension,
Calcutta 700013
Delhi *Bombay* *Madras*

ARCHIVED-2006

Registration No. R. N. 34762/78

(AITIHASIK : quarterly journal of history Declaration No.III
20.11.78

ARCHIVED

অরুণ কুমার দাশগুপ্ত কর্তৃক ৪৭।২ এ গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা ১৯ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং অটোপ্রিণ্ট এণ্ড পাবলিসিটি হাউস, ৪৯, বলদেওপাড়ে রোড, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত।